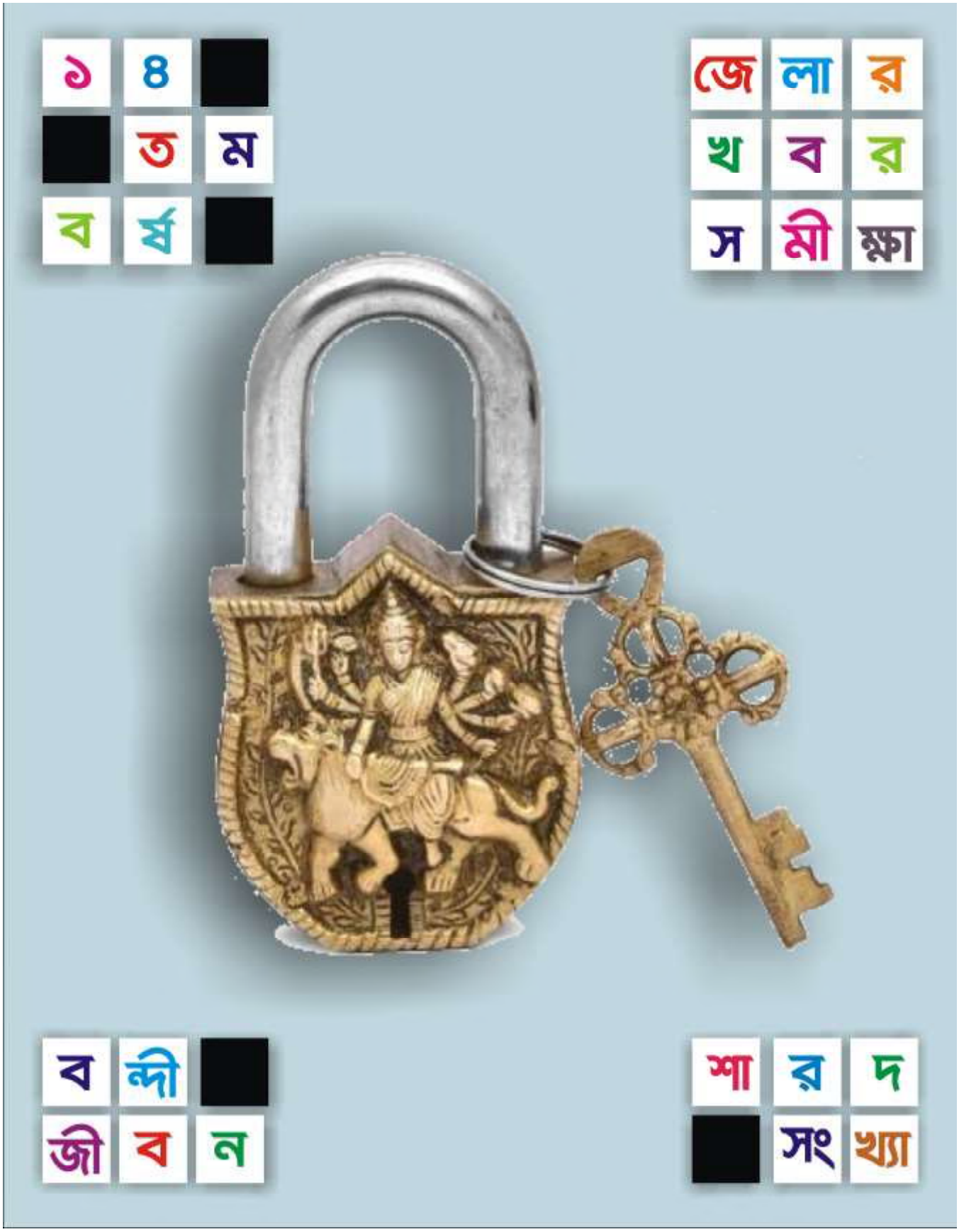

১৪ তম বর্ষ

জেলার খবর সমীক্ষা

বন্দী জীবন

শারদ সংখ্যা

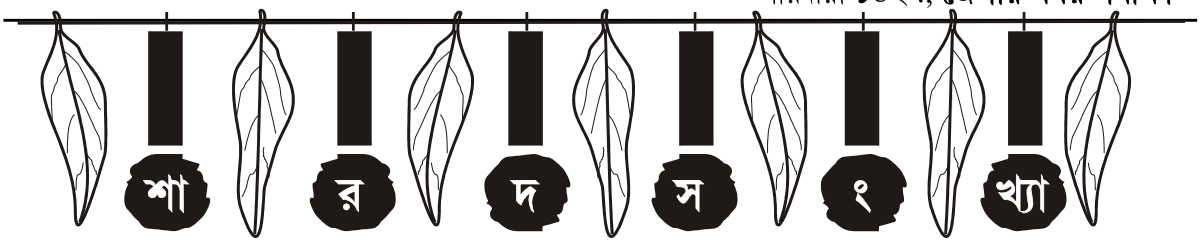

জেলার খবর সমীক্ষা

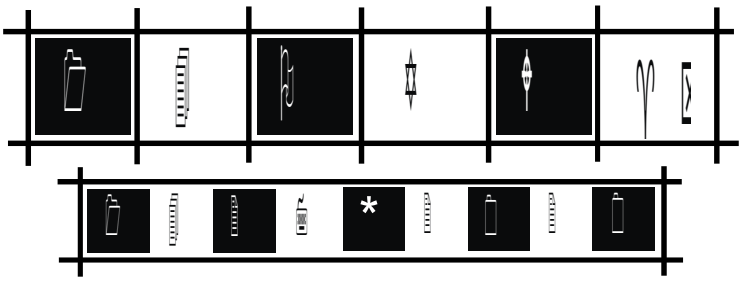

সূচিপত্র

মলাটি কথা

করোনাধারায় এসো	ডাঃ গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়	৪
করোনা-বন্দীর কলমে	তন্ময় সেন	৭
চারশো পঞ্চাশ কোটি বছর ধরে আমি বন্দী	ডাঃ শঙ্করকুমার নাথ	৯
কয়েনে কালাপানির বন্দিশালা	সুমিত্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১১
অবরুদ্ধ ইতিহাস	ডাঃ সুকান্ত মুখোপাধ্যায়	১৩
নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু এবং মান্দালয় জেল	সুরজিৎ দাস	১৫
শ্রী অরবিন্দ ঃ বন্দীশালা যখন মুক্তির মন্দির	সন্দীপ বাগ	১৭
আত্মবন্দী	সজল কুমার ঘোষ	২৪
জগৎ বন্ধন মাঝে	সুস্বাগত বন্দ্যোপাধ্যায়	২৬
বন্দী পুরাণ	পল্টু ভট্টাচার্য	২৮
বন্দীদশা	পারমিতা সরকার	২৯
বন্দীজীবন — বাইরে ভিতরে	প্রদীপ ভট্টাচার্য	৩২
বন্দী বীর	জহর চট্টোপাধ্যায়	৩৪
মুক্তি	সৌরভশঙ্কর বসু	৩৬

স্মরণ

মহিষাসুরমর্দিনী	বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র	৩৮
অখ্যাত গ্রাম থেকে খ্যাতির শীর্ষে	কল্যাণ গঙ্গোপাধ্যায়	৪৪

গল্প

খাঁচার পাখি বনের পাখি	উপল পাত্র	৪৬
অন্তর্জাল	সেমিতা গোস্বামী সাউ	৪৯

কবিতা

করোনা কাল	প্রদীপ ভট্টাচার্য	৫২
আরও দুয়েকটা দিন	সোমনাথ মুখোপাধ্যায়	৫৩
মা	সোমনাথ মুখোপাধ্যায়	৫৪
মুক্তির অপেক্ষায়	প্রণবকুমার দাস	৫৫
বন্দী যারা কষ্টে তারা	তাপস বাগ	৫৫
লক-ডাউন	বিনয় সরকার	৫৬
বন্দী জীবন	প্রিয়া কুণ্ডু নন্দী	৫৭
পাওনা	মালতী দাস	৫৭
পুজোর দিনে, সাবধানে / মহালয়ায় একা	জহর চট্টোপাধ্যায়	৫৮

সম্পাদকীয়

ছোট্ট একটা আণুবীক্ষণিক জীব কিন্তু তার মারণক্ষমতা অসীম। প্রায় বছর ঘুরতে চলল সারা পৃথিবী তার দাপটে নাজেহাল। করোনা ভাইরাসের কবলে আক্রান্ত পৃথিবীর সুদূরতম প্রান্তও, দিন দিন আক্রান্তের হার এবং মৃত্যু হারের বৃদ্ধির হিসেব নিকেশ দেওয়া নেওয়ার পালা চলছে। পৃথিবীর কোন দেশ এমনকি আমেরিকা, ফ্রান্স, ইটালি, জার্মানি, রাশিয়ার মত উন্নত দেশগুলিও এই ভাইরাসের কবল থেকে উদ্ধারের কোন উপায় বা কোন ওষুধ আবিস্কার করতে পারেনি। এই ক'মাসে গোটা পৃথিবীর নানা দেশে স্বাভাবিক কাজ কর্ম বিপুলভাবে ব্যহত হয়েছে। আমাদের দেশ টানা ৬৮ দিন লকডাউন করেও এর কবল থেকে নিস্তার পায়নি। নিস্তার যে কবে পাওয়া যাবে তার কোন সদুত্তরও নেই।

স্বভাবতই পত্রিকার কাজেও এর প্রভাব পড়েছে। ছোট পত্রিকায় বিজ্ঞাপন পাওয়া এমনিতেই সমস্যা তার ওপর এই করোনার সময় পাওয়া তো আরও দুষ্কর। বাধ্য হয়েই অনলাইনে পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হয়েছে।

এবারের বিষয় ভাবনা করোনাকে মাথায় রেখেই — বন্দীজীবন। শুধু করোনা নয় সারা পৃথিবীতেই মানুষ, পশু, পাখি নানা প্রাণী এমনকি এই পৃথিবীও এক অর্থে বন্দী। তাই করোনা ছাড়াও নানা ক্ষেত্রে এই বন্দীত্বের ভাবনা কেমন তারই প্রচেষ্টা নানা লেখায় প্রতিফলিত। পত্রিকা কেমন হয়েছে তার বিচার করেন পাঠকরাই। সেই বিচারের দায় থাক তাঁদেরই উপর।

সকলকে ***শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা*** জানাই।

With Best Compliments From

A WELL WISHER

SAROJIT MANNA

সুর ও কথা

আবৃত্তি, শ্রুতিনাটক শিক্ষা কেন্দ্র

ঃ প্রতি শনিবার ঃ

মাধব ঘোষ লেন, খুরুট,

ঃ প্রতি রবিবার ঃ

ডুমরাজলা, এইচ. আই. টি. কোয়ার্টার্স

যোগাযোগ - ৮০১৩৩৭৮১৬৫/৯৮৩০৪৭৬০২০

শারদীয়ার শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

ভাতেঘরী জনকল্যাণ সমিতি

ভাতেঘরী, জয়পুর,

হাওড়া - ৭১১৪০১

মানস কুমার মাজী (৯৯৩২০০৭১৬১)

করোনাধারায় এসো

ডাঃ গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়

(মনোরোগ বিশেষজ্ঞ এবং অধ্যাপক, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল)

সত্যি বলতে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ বা কোভিড নিয়ে গত পাঁচ ছ'মাস যা চলছে, তা যত না শারীরিক তারচেয়ে ঢের বেশি মানসিক !

মহামারী কিংবা অতিমারী এদেশে নতুন নয়। তবে এটা ঘটনা, উনিশশো আঠারো থেকে কুড়ি সালের স্প্যানিশ ফ্লু এর চেয়ে বড়ো কোনও মারীর ধাক্কা আমাদের উপর দিয়ে যায় নি।

সে তো এক সেঞ্চুরি আগের ঘটনা, তাই ভেবে দেখতে গেলে আমাদের জীবদ্দশায় করোনা অতিমারীই প্রথম এমন বিপাকে ফেলেছে। বিভিন্ন সময়ে প্লেগ থেকে ডেঙ্গু, জাপানি এনসেফ্যালাইটিস থেকে ইনফ্লুয়েঞ্জা, সব কিছুই এসেছে এবং গেছে, কোনওটিই এমন অসহায় করে দেয় নি। আমাদের এই অসহায় বোধটিকে দশগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে পেল্লায় পেল্লায় দেশের ধরাশায়ী হওয়ার ছবি এবং ভেসে আসা খবর, আজকের দুনিয়ায় যা মুহূর্তে মেলে। ওদেরই যদি এমন হাল হয়, তাহলে আমরা কি করব, এই ভাবনায় প্রতিটি ক্ষণে আমরা শিউরে উঠেছি। করোনা নিয়ে ভয়ের কিছুই নেই এটা যেমন অর্তি মূর্খেও বলবে না তেমনি একে নিয়ে শুরু থেকেই যা চলছে সেটিকে ভয়ের মারী আখ্যা দেওয়াই যায়। সার্স, মার্স, ইবোলা, নিদেনপক্ষে হাম কিংবা ডেঙ্গু জ্বরের মারণক্ষমতাও কিন্তু বাস্তবে করোনার চেয়ে বেশি। এদেশে টিউবারকিউলোসিসে অথবা অপুষ্টির কারণে প্রতিদিন যত মানুষ মারা যান, সুইসাইড এবং পথদুর্ঘটনায় গড়ে রোজ যত মানুষ অকালে ঝরে যান, সেসবের হিসেব কষলে করোনাকে আর তত ভয়ানক মনে হয় না।

কমিউনিটি স্তরে করোনার দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার ক্ষমতা অনেকটা হলেও করোনা আক্রান্ত মানুষের প্রতি দশজনের মধ্যে আট ন'জনেরই তেমন কিছুই হবে না এটা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। বাস্তবিক, সংক্রমিত বহু লোকে বুঝতেও পারবেন না তাঁদের করোনা হয়েছে। বিপদটা এখানেই আছে, বিশেষত যখন মৃদু লক্ষণ নিয়ে লোকেরা কমিউনিটির মধ্যে আরাম সে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আশি পঁচাশি বছর বয়সের উপরের মানুষ, অশক্ত, অন্য ক্রনিক রোগের রোগী, যথা যাঁদের নিয়মিত ডায়ালিসিস বা কেমোথেরাপি, রেডিওথেরাপি নিতে হয়, তাঁদের ঘিরে নিশ্চয়ই ভয় দুশ্চিন্তা আছে, কিন্তু অন্য এপিডেমিক বা প্যানডেমিক এর তুলনায় কোভিডে মৃত্যুর হার এদেশে কমই বলা যায়, প্রতি বিশহাজারে পাঁচজন!

অন্যান্য মারীর সাথে করোনার তফাৎ হলো, এর আগের কোনও এপিডেমিক বা প্যানডেমিকের সময় মিডিয়া বিশেষত সোস্যাল মিডিয়া এত সক্রিয় ছিল না। হাজার একটা খবর, কোনটা সত্যি, কোনটা মিথ্যে বোঝা দায়, হাতে হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে -- নিমেষে ফরোয়ার্ডেড হয়ে পৌঁছে যাচ্ছে আরও কতো মস্তিষ্কে! টিভি খুললেই সংবাদ পরিবেশনের দপ্তর দেখলে আঁতকে উঠতে হয়! কি করবেন মানুষ? তাই ব্যাধির চেয়ে আধিই হলো বড়ো। বিগত আধখানা বছর জুড়ে মিডিয়ার সিংহভাগ আর আমাদের মস্তিষ্কের পূর্ণ অংশ জুড়ে কেবলই করোনা, কেবলই উদ্বেগে, বিপন্নতা আর অবসাদ।

মানুষের মনের প্রবণতাই হলো সে অনিশ্চয়তা পছন্দ করে না। অথচ এ এমন পরিস্থিতি যার অনেকটাই অনিশ্চিত। কতটা পরিস্কার, স্যানিটাইজার না সাবান জল, কাজের লোকেরা বাড়িতে ঢুকবে কি না, রোগটা হলে কোথায় যাবো, বয়স্ক মানুষজনের হলে কি হাসপাতালে ভর্তি করতেই হবে, এমন হাজারো প্রশ্ন, চিন্তা, যাদের কোনওটিরই সঠিক জবাব জানা নেই।

আইসোলেশন, কোয়ারেন্টাইন, লকডাউন এমন কতো নতুন নতুন শব্দ, প্রতি শব্দেই ধাওয়া করছে ভয়। হাত ধুতে ধুতে চামড়া উঠে গেল, বাড়িতে খবরের কাগজ, সবজি ঢোকাতেও ভয় -- এই বুঝি সে আসে।

ছোট ছেলেমেয়েদের স্কুল নেই। অনলাইন ক্লাস চলছে, তা নিয়েও সমস্যা আছে। লকডাউনের ধাক্কায় বহু মানুষ

কর্মহীন। পাড়া প্রতিবেশী, আত্মীয় স্বজনদের সাথে সামনাসামনি দেখা হওয়ার সুযোগ নেই। আর্থিক সামাজিক এমন অসংখ্য মানসিক চাপে পঙ্গু তো হবেই মানুষ।

কোভিডের সময়ের মনস্তত্ত্বের কথা ভাবতে গেলে সবার আগে কিন্তু মনে আসছে এদেশের ঘরে ঘরে দীর্ঘ দিন মানসিক রোগে ভুগতে থাকা রোগিদের কথা, যাঁদের সরাসরি দেখার সুযোগ নেই, অনেকের ওষুধ মাঝপথে বন্ধ হওয়ার কারণে রোগটাই বেড়ে যাচ্ছে। বহু মানসিক প্রতিবন্ধী, ডিমেন্সিয়ায় ভোগা মানুষের বাড়ির লোকের দশাও বড়ো সুবিধের নয়।

উদ্বেগে রাতের ঘুম উড়ে গেছে মানুষের। একটু গলাব্যাথা, সামান্য কাশি, সাথে সাথেই শরীরে কাঁপন, এলো নাকি সে? তৈরি হয়েছে 'ওয়ারিড ওয়েল পপুলেশন' — সংখ্যাটা বাড়ছে প্রতিটি দিন। কবে শেষ হবে লকডাউনের? কবে আবার ঘুরে দাঁড়াবে মানুষ? খরচের শেষ নেই, রোজগার? বিষন্নতা বাড়ছে। সাথে বাড়ছে মৃত্যু চিন্তা। পারস্পরিক সম্পর্ক বহু পরিবারেই বড়ো সুবিধের নয় এখন। যাঁরা আইসোলেশনে তাঁদের আরেক রকম চিন্তা। প্রতিবেশী কারও করোনা শুনলে আরও একরকম। যে পরিবারের মানুষ চলে গেছেন এই সময়, কারও বিষাদ, কারও বা পোষ্ট ট্রমাটিক ডিসঅর্ডার, ঘুমের মধ্যেও চমকে উঠছেন তাঁরা। বাতিকের রোগে যাঁরা এতকাল ভুগেছেন, দিবারাত্তির জল ঘাঁটা আর ছোঁওয়া ছুঁয়ি নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন, তাঁদের অনেকেই খানিকটা তৃপ্ত মুখে না বললেও হাবেভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছেন, দেখলে তো আমরাই ঠিক ছিলাম। অনেকের আবার ধোওয়া মোছা খুব বেড়েছে, করোনা রোধের চেষ্টায় কোনও করোনার (কর্ণার) ই ছাড় পাচ্ছে না। বহু পরিবারে এতো কাল গৃহশান্তি বজায় থাকত বাড়িতে একসাথে কম সময় থাকতে হতো বলেই। এখন আর সে জো টি নেই! নেশার জোগান কম ছিল শুরুর দিকে - তাতে পরিবার গুলো বেঁচেছিল। এখন আর সে উপায়ও নেই, শুঁড়িকেও তো বাঁচতে হবে!

মোট কথা, কেউই স্বস্তিতে নেই। সামাজিক দূরত্ব বিধির সতর্কতায় সবচাইতে বেশি সমস্যায় আছেন তাঁরা, যাঁরা বয়সোচিত সীমাবদ্ধতায় এই প্রযুক্তির যুগে না পারছেন সংযোগের সেই পদগুলি ব্যবহার করতে, না দেখতে পারছেন প্রিয়জনদের মুখ। বহু পরিবার কেবলমাত্র বুড়ো বুড়ির সংসার, কেউ কেউ একেবারেই একা। করোনাকাল তাঁদের নিঃসঙ্গতা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। বাড়ির ছোটদের জীবনও অনেক বদলে গেছে। বাড়িতে সকলেই রয়েছে এটা যেমন একটা নতুন ব্যাপার, তেমনি বাইরে বেরিয়ে খেলতে যাওয়া, খানিকটা ঘোরাঘুরি, বেড়ানোর দিনগুলো, সবই তো সংকুচিত। বয়ঃসন্ধির ছেলেমেয়েরা এখন সবসময়ই নজরে নজরে। পরীক্ষা, জীবনের পথে এগিয়ে যাওয়ার প্রতিযোগিতা সবটাই কেমন থমকে আছে। অনিশ্চয়তার আবর্তে তারাও খুব একটা ভালো নেই। আরও একটা ব্যাপার হলো, বয়ঃসন্ধির অবসাদের ধরনধারণ এমনিতেই অদ্ভুত। কখনও রাগ, বিরক্তি, কখনও বা কান্নায় ভেঙে পড়া, কখনও দেখে মনে হয় কিছুই তো হয়নি। এর সাথে আগেই যুক্ত ছিল মোবাইল, ইন্টারনেট, গেমিং- কোভিডের অবসর সোশালাইজেশনের সব সুযোগ সরিয়ে নিয়ে এখন বিহেভিয়ারাল অ্যাডিকসনের মহামারীর অশনি সংকেত দিচ্ছে আগামী দিনে।

এসব নিয়েই ভাবনা। করোনা তো একসময় চলেই যাবে, যেতেই হবে তাকে। হয়ত নতুন কিছু আসবে। করোনা না এলেই কি আমরা দুর্দান্ত থাকতাম? দুর্নীতি, লোভ, হিংসা, ঈর্ষা, বিদ্বেষ, কোনটা ছিল না? করোনা বরং আমাদের একটা ওয়ার্নিং দিয়েছে, যাতে সময়মতো নিজেদের গুছিয়ে নিতে পারি আমরা। আগেই বলেছি, করোনা অতিমারীকে নির্মূল করার জন্য এখনও পর্যন্ত আমাদের না আছে কোনও ওষুধ, না আছে ভ্যাক্সিন। তাই হাইজিন প্র্যাকটিস আর দূরত্ব বজায় রাখা ছাড়া আর কিছুই আপাতত বলার মতো প্রয়োগিক স্তরে কিছুই নেই। নিয়মগুলো মানতেই হবে সরকার না বললেও মানতে হবে নিজেদের স্বার্থেই। দশজনের মধ্যে আটজন ঠিক মাক্স ঠিকভাবে পরাটাই তো একটা বিরাট সম্বল হতে পারে। সমস্যা হলো, দেবদূত যেখানে যেতে ভয় পায়, মূর্খরা সেখানেও বুক ফুলিয়ে চলে যায় অনায়াসে!

মনের স্বাস্থ্য ধরে রাখতে গেলে মনে রাখতে হবে, করোনা কোনও নিরবচ্ছিন্ন ছুটির সময় না। সতর্ক হয়েও কাজ করা যায়। ছন্দ টাকে ফিরে পেতে গেলে সবার আগে নিজেদের স্ট্রাকচার টা আবার তৈরি করতে হবে নিজ নিজ

তাগিদেই। এটা একটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতি, তবু তাতে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকাটা কোনও কাজের কথা নয়। বহু মানুষের মনের জোর কমছে। বর্তমানের স্থিতাবস্থার মধ্যেও ভবিষ্যতের অমানিশা ইঙ্গিতে ভেতরে ভেতরে দমে আছেন অনেকেই। তাই ওষধি হিসেবে ধৈর্য আর মানিয়ে নেওয়ার কৌশল রপ্ত না করে উপায় নেই।

সবার আগে যেটা বোঝা দরকার তা হল, —

— নিজের বাস্তব পরিস্থিতি বুঝে নিয়ে তাকে গ্রহণ করাটাই আসল কাজ।

— আমাদের চাওয়া বা না চাওয়া দেখে করোনা আসেনি, যাবেও না। এটা ভেবে নিয়েই গেমপ্ল্যান তৈরি করতে হবে।

— উদ্বেগ মানুষের জীবনের স্বাভাবিক অংশ। উদ্বেগের আসল উদ্দেশ্য হলো আমাদের সীমানার মধ্যে কিছু একটা ঢুকছে, সেটা সম্পর্কে আমাদের অ্যালার্ট করা। অনেকটা ফায়ার অ্যালার্ম এর মতোই এর কাজ -- আমাদের প্রস্তুত থাকতে সাহায্য করে উদ্বেগ, তবে প্রয়োজনের তুলনায় বাড়তি উদ্বেগ উৎকণ্ঠা আমাদের সিদ্ধান্ত নির্ণয়ের ক্ষতিই করে।

করোনাকে দুবেলা অভিসম্পাত না করে বরং বুঝতে শিখুন এই অতিমারী আমাদের শিক্ষকের ভূমিকায় এসেছে। যে সময়টা বাড়তি পেয়েছেন সেই সময় আর কখনও পাবেন না ধরে নিয়ে পরিবারে সময় দিন। একটা ইমোশনাল ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলুন নিজের পরিবারের মধ্যে -- পজিটিভ ইমোশন, ছোট্ট ছোট্ট সদর্থক মন্তব্য, মজা, একসাথে কাজ করার আনন্দ পরিবারের ছোট বড়ো সকলের সাথে ভাগ করে নিন। ছোটরা দায়িত্ব নিতে শিখবে। দাদু ঠাম্মা-র সাথে মেলামেশার দরজা খুলে গেলে ছোটদের রাগ, জেদ, চাহিদা কমে যায় এটা গবেষণায় দেখা গেছে।

— গৃহবন্দী হওয়ার বাধ্যবাধকতা আজ সেই সুযোগ দিলে সেটা নষ্ট করবেন?

— আপনাদের প্রত্যেকের মধ্যে যে সৃজনশীল মনটা রয়েছে, তাকে প্রশ্রয় দিন, অনেক কিছুই বদলে যাবে।

— আজকের পরিস্থিতি আমাদের জীবনে অল্পে সন্তুষ্টির জায়গা খুলে দিয়েছে। এতকালের অভ্যাসে যা যা না পেলে আমাদের চলবে না মনে হতো, খেয়াল করে দেখুন তাদের বহু কিছু অপ্রয়োজনীয়!

— কোভিডের পরিবেশ হয়ত আপনার অনেক আর্থিক সামাজিক ক্ষতি করে দিল, কিন্তু ভেবে দেখুন এমন পরিস্থিতিতে বেঁচে থাকার, টিঁকে থাকার শিক্ষা আপনার আত্মবিশ্বাস কতখানি বাড়িয়ে দিয়ে গেল।

তাই করোনাকে ধন্যবাদ দিন, আপনার ভেতরের শক্তি টুকু করোনা অতিমারী না এলে চিনতেই পারতেন না, এটা ভেবে!

সাবধানে থাকবেন সকলে।

নেলসন রোলিহাল্লাহাল্লা ম্যাণ্ডেলা দীর্ঘ ২৭ বছর বন্দী জীবন কাটিয়েছেন। ১৯৬২ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার তৎকালীন শেতাঙ্গ সরকার ম্যাণ্ডেলাকে গ্রেপ্তার করে এবং অন্তর্ঘাত সহ নানা অপরাধের দায়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়। তাঁর এই দীর্ঘ ২৭ বছরের বন্দী জীবন কেটেছে রবেন দ্বীপ, পলসেমুর কারাগার এবং ভিক্টর ভার্সটার কারাগারে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চাপের মুখে এবং বর্ণবাদী গৃহযুদ্ধের আতঙ্কে দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রপতি এফ. ডবলু. ডি. ক্লার্ক ১৯৯০ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী নেলসন ম্যাণ্ডেলাকে কারাবাস থেকে মুক্তি দেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় ম্যাণ্ডেলা 'মাদিবা' নামে পরিচিত, তাঁর গোষ্ঠির ভাষায় যার অর্থ 'জাতির জনক'। কারামুক্তির পর ম্যাণ্ডেলা দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে বর্ণবাদ নিবৃত্তির কাজ শুরু করেন। ১৯৯০ সালে 'ভারতরত্ন', ১৯৯৩ সালে 'নোবেল শান্তি পুরষ্কার' লাভ করেন এবং ১৯৯৪ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন।

করোনা-বন্দীর কলমে

তন্ময় সেন

বহুদিন বন্দীদশা কাটানোর পর আজ আমার বাধ্য ও সাধের বাইকটি বিদ্রোহ প্রকাশ করছে। কিকের পর কিক্ মেরে চলেছি, কিন্তু কিছুতেই আর স্টার্ট হচ্ছেনা। অগত্যা প্লাগের ডানে থাকা কার্বন পরিস্কার করতে করতে মনটা চলে গেলো সঞ্জিবন হসপিটাল-এর বেডে যেখানে আমি দীর্ঘদিন বন্দীদশা কাটিয়েছি।

আমার বন্দীদশার শুরু ১৯শে আগষ্ট রাত থেকে। অফিসে বসেই জ্বর-জ্বর ভাব লাগছিলো। কোনোরকমে বাড়ি ফেরার পরই খুব জ্বর। থার্মোমিটার জানান দিলো তাপমাত্রা ১০২ ডিগ্রি-র ওপরে, তার সাথে গলা ব্যাথা আর সারা শরিরে একটা অদ্ভুত অস্বস্তি। রাতটা 'ক্যালপল' এর ভরসায় কোনোরকমে কাটলো, সকালেই ছুটলাম ইন্ডাস নার্সিহোম-এ। এলাকার এক নাম করা ও অতি পপুলার ডাক্তারবাবুকে দেখাবার আশায় নাম লিখিয়ে বসে থাকলাম। অকেক্ষণ অপেক্ষা করার পর আমার ডাক আসাতে ওনার ঘরে-এ ঢুকে জ্বরের কথা বললাম। জ্বর শুনতেই আমাকে তিরস্কার করে বললেন যে জ্বর নিয়ে আমি কেন ওনার কাছে এসেছি। ইন্ডাস কতৃপক্ষ বলে আমাকে ঢুকতে দিয়েছেন, ওনার চেম্বার হলে নাকি উনি ঢুকতেই দিতেন না। এখন কোভিড সিচুয়েশন মেনে নাকি জ্বরের রুগীদের দেখা যাবে না। কথা শুনে আমি তো হাঃ। মনে মনে ভাবলাম জ্বর হলে ডাক্তারের কাছে যাবোনা তো কি জুতো সারাইয়ের দোকানে যাবো। যাই হোক উনি আমাকে কোনোরকমে দেখে কিছু ব্লাড টেস্ট লিখেদিলেন। মনে আশা নিয়ে বাড়িতে ফিরে টেস্টগুলো করালাম।

পরের দিন টেস্ট-এর রিপোর্ট নিয়ে আমার এক আত্মিয় ওনার কাছেগেলেন। সব ওকে থাকায় সেদিন আবার ডেঙ্গু আবার ম্যালেরিয়া-র টেস্ট করতে বললেন। পরের দিন সেগুলোও নেগেটিভ বেরোতে টাইফয়েড আর ইউনিয়ন কালচার-এর টেস্ট লিখেছিলেন কিন্তু কিছুতেই COVID এর Test করার কথা লিখলেন না। এই ভাবে টেস্ট করতে করতে আর ওনার অভয়বানি শুনতে শুনতে পুরো পাঁচটাদিন কেটে গেলো, ততদিন আমি শারীরিক ভাবে প্রচুর কাহিল হয়েগেছি। পঞ্চমদিনে আমার শ্বাসকষ্ট প্রবল আকার ধারন করায় এবং আত্মিয়স্বজন আর এক বন্ধুর চাপে আমি Personally Dr. LAL PATH কে দিয়ে Swap Test করালাম। ২৬শে আগষ্ট ওরা রিপোর্ট পাঠানোয় জানলাম আমি COVID Positive।

যাই হোক পরের দিন ২৭-এ আগষ্ট আমি হাওড়া জেনারেল হাসপাতাল হয়ে উলুবেড়িয়ার সঞ্জিবন হসপিটাল-এ ভর্ত্তি হলাম। একটা বড় রুম-এ যেখানে পনেরোটা বেড ছিল, সেখানে আমি পাঁচ নম্বর রুগী। দেখলাম দু'দিনের মধ্যে পনেরোটা বেড তো ভরে গেলোই উপরন্তু পাশের একটা ঘরের বারোটা বেড ও হু হু করে ভরে গেলা। এটা ঠাহর করতে পারলাম করোনা আক্রান্তের সংখ্যা কি হারে বাড়ছে।

প্রথম সাতদিন প্রচন্ড শ্বাসকষ্ট আর হাই ফিভার নিয়ে আমার খুবই কষ্টে কাটলো। যেহেতু কোন আত্মীয়স্বজনের মুখ দেখার কোনো চান্স নেই, খুব অসহায় আর একা লাগতো, সেই সময়। ২৪ ঘন্টা অক্সিজেন আর ওষুধ খেতে খেতে আমার অবস্থা শোচনীয়। চিকিৎসা পদ্ধতি অত্যন্ত Systematic। আমি যেই ডাক্তারবাবুর অধিনে ছিলাম, ওঁনার নাম Dr. Murtuja, খুবই দাইত্ববান ও সংবেদনশীল মানুষ বলে মনে হয়েছে। ওখানে একটা জিনিষ লক্ষ্য করলাম যে, সবাই করোনা আক্রান্ত রুগি হলেও সবাই কিন্তু আমার মত কষ্টে নেই। তাদের অনেকেই বাড়ির মত আড্ডায় মগ্ন, কেউ আবার মুঠোফোনে সারাদিন ব্যস্ত, আবার কারো আব্দার যেহেতু কোনো কষ্ট নেই। তাদের যেন আজই ডিসচার্জ করে দেওয়া হয়। এটা বুঝলাম, করোনা আক্রান্ত মানেই কিন্তু ভয়ের বা আতঙ্কের কোনোই কারণ নেই। আসলে যাদের শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা মোটামুটি স্বাভাবিক তাদের কিন্তু করোনা সেভাবে কাবু করতে পারে না।

সাতদিন পরে অপেক্ষাকৃত ছোট একটা ঘরে আমাকে শিফ্ট করা হলো। ওখানে শুধু সাতখানা বেড। তারমধ্যে একটাতে আমার জায়গা হলো। লক্ষ্য করে দেখলাম ঘরটা

একটা উঁচুমানের হোটেলের রুম থেকে কিছু কমনা। যাওয়ার সাথে সাথে আমাকে মিনারল ওয়াটার, টুথ পেষ্ট, টুথ ব্রাসও শ্যাম্পুর পাউচ দেওয়া হলো। আমি বেশ অবাক হলাম। তবে এখানে আসার পর আমার ডাক্তারবাবু বদলে গেলেন। আমি Dr. Vishal Prasad-এর অধীনে চলে এলাম। দু'দিনের মধ্যেই বুঝলাম, তিনি একজন উঁচু মনের মানুষ, তার অমাইক ব্যবহার দিয়ে সব রুগিদের মন জয় করে নেন আর ওঁনার কথাবার্ত্তাতেই অর্ধেক রোগ সেরে যায়। তিনি প্রথমদিন থেকেই আমার বন্ধু হয়েগেলেন আর ওঁনার জীবনের নানান ঘাত-প্রতিঘাতের কথা আমার সাথে শেয়ার করলেন। নার্সদের কথা না শুনলে অন্যায় হবে। ওরা অত্যন্ত ট্রেন্ড আর নিজেদের কাজে খুব সিরিয়াস, এখানে না এলে আমি জানতে পারতাম না যে সরকারী হাসপাতালও এত উন্নত হয় এত সিস্টেম। এই ঘরের সব রুগীদের সাথেও আলাপ হয়েগেল ওদের সবার সাথে কথা বলেও একটাই উপলব্ধি হলো যে, যদি কিছু নিয়ম মেনে চলা যায় তাহলে করোনাকে এড়ানো যায় বা সঠিক চিকিৎসায় করোনাকে আয়ত্ত করা যায়।

এই ঘরে আসার পর আমার শ্বাসকষ্টও ধিকে ধিকে কমতে থাকলো আর ক্রমে ক্রমে অক্সিজেন দেওয়া বন্ধ করে ও কোনো সাপোর্ট ছাড়াই ৯৭ হয়েগেলো। জ্বরও কমে গেল ধীরে ধীরে। উন্নত চিকিৎসা আর ডাক্তার ও নার্সদের চেষ্টায় ১৪ দিনের মাথায় আমি পুরো সুস্থ হয়ে গেলাম। ফলস্বরুপ ১১ই সেপ্টেম্বর আমি ডিসচার্জ হয়ে বাড়ি ফিরলাম, আর এর সাথে সাথেই বন্দীদশা থেকে আমি মুক্ত হলাম।

হঠাৎ আমার সম্বিত ফিরলো কারণ বাইকটা সশব্দে গর্জন করে স্টার্ট নিয়ে নিলো। আমি একলাফে সিটে বসেই এক্সিলেটারের মোচড় দিলাম। আজ বাইকও বন্দীদশা মুক্ত।

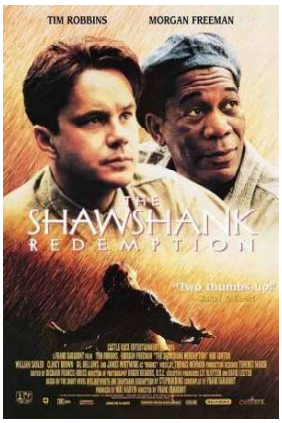

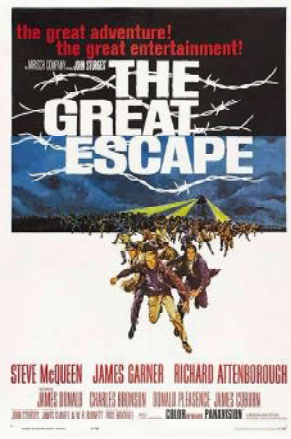

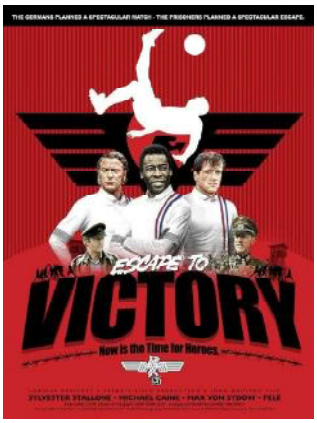

কেউই বন্দী থাকতে চায় না। তা সে অপরাধের সাজা পেয়ে জেল বন্দী হোক আর বিনা-অপরাধে বন্দী হোক। কিন্তু চাইলেই তো মুক্তি মিলবে না, জেল মুক্তি পাওয়াতে অনেক আইনি প্যাঁচ পয়জার থাকে। সাজার মেয়াদ যাদের বড়সড় তারা তো মুক্তির জন্য বেশী অধৈর্য্য হয়ে ওঠে। জেল থেকে পালানোর ফন্দি আঁটে। তবে সবার ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ে না, পালাতে গিয়ে ধরা পড়ে শাস্তির মেয়াদ বাড়ে। কেউ আবার জেল থেকে পালিয়েও কিছুদিনের মধ্যে ধরা পরে যায়। যারা নিখুঁত ভাবে পালাতে পেরেছে, নিজেকে মুক্ত করতে পেরেছে, তাদের জেল ভাঙার কাহিনী রোমহর্ষক। সে কাহিনী যদি চোখের সামনে দেখতে পাওয়া আরো রোমাঞ্চকর। কয়েদীর জেল পালানোর ঘটনা নিয়ে প্রচুর ছবি হয়েছে পৃথিবীর সব ভাষাতেই। এখানে ইংরাজী ভাষার কয়েকটি ছবির পোষ্টার দেওয়া হল। ছবি গুলি দেখা না থাকলে অবশ্যই দেখে নেবেন। ছবি গুলির এমনই দর্শক পালানোটাকে সমর্থন করতে বাধ্য হবেন। বন্দীদের মুক্তির মধ্যে আপনিও মুক্তির স্বাদ পাবেন।

চারশো পঞ্চাশ কোটি বছর ধরে আমি বন্দী

ডাঃ শঙ্করকুমার নাথ

হ্যাঁ, আমি গত প্রায় ৪৫০ কোটি বছর ধরে বন্দী অবস্থায় জীবন-যাপন করে চলেছি। আমার 'অন্য কোথা অন্য কোনখানে' যাবার কোন অনুমতি নেই। এভাবে পারা যায় একই পথে আমাকে কলুর বলদের মত ঘুরপাক খাইয়ে যাচ্ছে এই এতগুলো বছর ধরে। একটুও স্বাধীনতা নেই আমার।

হ্যাঁ, আমি পৃথিবী-গ্রহ, বন্দী হয়ে আছি আমার মালিক সূর্যবাবুর কাছে, একেবারে ক্রীতদাস। উনি যে কী সুখ পান এতে, জানিনা। আপনারা দেখেছেন, ইতিহাসে পড়েছেন, আফ্রিকায় ক্রীতদাস প্রথা ছিল — মানুষ কেনা-বেচা হত একসময় আর সেই ক্রয় করা মানুষ একেবারে গোলাম হয়ে যেত মালিকের। শুধু ফাই-ফরমাস খাটো। বাড়িতেই থাকো বন্দী হয়ে, বাইরে যাবার অনুমতি নেই। এর বিনিময়ে দু'মুঠো খেতে দেওয়া, তাও যথেষ্ঠ হতো না। তারপর একসময় এইসব ক্রীতদাস খাটতে খাটতে, কম খেতে খেতে বৃদ্ধ হতে হতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তো — ব্যস্, জীবন শেষ।

আর আমার মালিক সূর্যবাবু, যিনি আমায় আজন্ম ক্রীতদাস করে রেখেছেন, তিনি তো আমায় একদিন হাসতে হাসতে বললেন, তোকে তো আমি খাঁচায় বন্দী করে রাখিনি, তোকে তো আমি ছেড়ে দিয়েছি এই এতবড় আকাশে, তুই ফ্রি। তোকে আমি আমার রোদ দিয়ে পুষ্টির জোগান দিই, তোর চারিদিকে সুন্দর একটা আবহাওয়া তৈরি করে তোর পর্যাপ্ত খাবারের ব্যবস্থা করে দিয়েছি এমনকি তোর একটা ছানাও আমি দিয়েছি, যাকে তোর লোকজন চন্দ্র বলে। আমার ছেলেপুলেদের মধ্যে তো তোকেই আমি সবচেয়ে বেশি ভালবাসি, নইলে তোরই জন্যে এত করবো কেন? এরপরও তুই বলবি যে, তোকে আমি বন্দী করে রেখেছি, স্বাধীনতা হরণ করেছি? অকৃতজ্ঞ।

কি অদ্ভুত কথা — ঠেকায় পড়ে এখন আমাকে সন্তান বলছে। আরে বাবা, সব কিছুর ব্যবস্থা করে দিলেও তুমি তো আমার চলবার পথটাকে নির্দিষ্ট করে বেঁধে দিয়েছো, তোমার চারদিকে ঘোরবার জন্য ঐ যে একটা কক্ষপথ বেঁধে দিয়েছো, তার বাইরে যাবার তো আমার কোন পারমিশন নেই; কক্ষপথ থেকে একটু সরে যাবারও কোন অধিকার নেই।

চুপিচুপি বলি আপনাদের, মাঝে মধ্যে নয়, প্রায় জন্ম থেকেই এই কারণে আমার খুব রাগ আছে সূর্যিবাবুর উপর, আমি রিভোল্ট করি। তাই খুব ধীরে ধীরে হলেও আমার কক্ষপথটিকে আমি একটু একটু করে সরিয়ে নিয়ে যাই। এসব কেবলমাত্র আমার জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা জানে। এই দেখুন না, গত সাড়ে চারশো কোটি বছর ধরে আমি সূর্যবাবুর চারিদিকে ঘুরে চলেছি একটি উপবৃত্তাকার কক্ষপথে, একবছরে একপাক, কাজের বিরাম নেই, কষ্ট হলেও বলা যাবে না, 'না' বলার কোন জায়গাই নেই, তা, এই উপবৃত্তাকার পথে চলতে চলতে আমি বছরে অন্তত একবার সূর্যবাবুর খানিকটা কাছে আসতে পারি। আর আমার এই অবস্থানটিকে ওরা বলে পেরিহেলিয়ন। আবার সূর্যবাবুর থেকে একটা আমার দূরবর্তী অবস্থানও আছে, একে বলে অ্যাপহেলিয়ন। যেমন ধরুন, এই বছর ২০২০ সালের ৫ জানুয়ারী তারিখে আমি সূর্যবাবুর কাছে এসেছিলাম। কিন্তু গোপনে একটা কথা বলি, আমি আগের বছরে ২০১৯ সালে পেরিহেলিয়নে ছিলাম ৩ জানুয়ারি, তখন সূর্যবাবুর থেকে আমার যা দূরত্ব ছিল এবছর তার থেকে আমি ১.৫ সেন্টিমিটার দূরে সরে গেছি, এই ভাবেই একটু একটু করে আমি সরে যাব। দেখি, মালিক কি করতে পারে। আর এ-বন্দীদশা আমার সহ্য হচ্ছে না।

এই সীমাহীন ''ব্রহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড''-এর মধ্যে কি সব জটিল ব্যাপার-স্যাপার চলছে, তা সাধারণ বুদ্ধিতে আমার মাথায় আসছে না, তবে এইরকম একেবারে শূণ্যে মহাকাশে আমার কীভাবে জন্ম হল, আমি বাবা জানিনা। এবিষয়ে নানা মুনির নানা মত হলেও ''নেবুলার প্রকল্প''-টাই নাকি, সকলে বলছে, বেশি গ্রহণযোগ্য। ওরা সব বলছে, এই মহাশূণ্যে নানান গ্যাস এবং ধূলিকণা এক জায়গায় জড়ো

হয়েছিল আর সেখান থেকে বহু বছরের ভাঙা-গড়া, ঘনীভবন, মাধ্যাকর্ষণ ইত্যাদির মাধ্যমে তৈরি হয়েছিল আমাদের মালিক সূর্যবাবু এবং আমরা অর্থাৎ আমি এবং আমার সব ভাই বোনেরা — সে সব ৪৫০ কোটি বছর আগের কথা। ভাবতেও অবাক লাগে, এসব কথা নাকি অনেক বছর আগে ১৭৫৫ সালে ইমানুয়েল কান্ট সাহেব তাঁর লেখা গ্রন্থে বলে গেছেন।

সে যেভাবেই আমার জন্ম হোক না কেন, প্রশ্নটা হল, জন্ম থেকেই কেন আমার স্বাধীনতা হরণ করা হল। সকলে বলছে নাকি এটা আমার ভালোর জন্যেই। তা, এই বুড়ো বয়সেও কি আমার এই বন্দীদশা চলবে?

কে বললো, আমি বুড়ো? মাত্র তো ৪৫০ কোটি বছর বয়স আমার, আরও কয়েকশো কোটি বছর থাকবো আমি এই মহাকাশে। ও-হো, বলতে ভুলে গেছি। আমার মালিক সূর্যবাবুও কিন্তু প্রায় একশো কোটি বছর পর থেকে ধীরে ধীরে লাল-দানব হতে থাকবে। আমি তো আতংকিত। শুনলাম, তারপর সূর্যবাবু নাকি আজ থেকে ছশো কোটি বছরের মধ্যেই এত বৃহৎ লাল-দানবে পরিণত হবে যে, আমার সামনে থাকা আমার দুই ভাই বুধ আর শুক্র গ্রহসহ আমার কক্ষপথ যতদূরে সূর্য থেকে, তার সবটাই নাকি সূর্যবাবু আস্ত গিলে খেয়ে ফেলবেন। তখন আমার মৃত্যু অবধারিত। কি আশ্চর্য্য বলুন, মহাকাশে আমাদের ছেড়ে দিয়েও বন্দী করে রেখে দিয়েছিলি বাবা, তারপরও সূর্যবাবুর আশ মিটলো না? এরপর আমাদের আস্ত গিলে খাবি? এত সার্ভিস দেবার পর এই আমাদের কপালে লেখা ছিল? এইভাবে আমাদের মৃত্যু। উঃ, ভাবতে পারছি না, এতো সতীদাহ প্রথার মতো সহমরণে যাওয়া!!

আমার জীবজন্তু, গাছ-পালা, মাটি, জল, পাহাড়-সমুদ্র, যত ধনসম্পত্তি আমি গত ৪৫০ কোটি বছর ধরে তিল তিল করে তৈরি করেছি, আমার নেওটা বাচ্চা চাঁদসোনা, যে আমার আঁচল ধরে আর ছাড়তে চায় না — এদের সকলকে নিয়ে আমি চলেছি; আর বলে কিনা জোরপূর্বক জহরব্রতে যেতে হবে? এদের সকলের জন্য আমার কষ্টের সীমা নেই। দূর্ বাবা, আমাদের মৃত্যুর আশংকা এত তাড়াতাড়ি করছিস বা কেন? সে অনেক দেরি আছে।

হে, আমার সন্তানেরা, তোমরা সবাই ভাল থেকো। মনে রেখো, তোমাদের মুখের হাসি দেখার জন্যই আমি আমৃত্যু বন্দী হয়ে থাকতে রাজি।

গ্রিক পুরাণে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বন্দীশালা 'তার্তারুস'। পুরাণমতে এটি নরক-প্রদেশ, পৃথিবীর পাপাত্মারা তাদের কৃতকর্মের জন্য এখানে শাস্তি পেত। কোনো পাপাত্মা যাতে এখান থেকে পালাতে না পারে তাই 'সের্বেরুস' নামে তিন মাথাওয়ালা ভয়ানক এক কুকুর 'তার্তারুস' পাহারা দেয়। কেউ পালাবার চেষ্টা করলেই সের্বেরুস' তাকে হত্যা করত। 'তার্তারুস' বা নরকের বন্দীশালার রাজা ছিলেন মৃত্যুর দেবতা 'হেডিস'। 'তার্তারুস'-এর প্রথম বন্দী হল 'সাইক্লপস' আর 'হেকাথনকেরিস'। আকাশের আদি দেবতা 'ঔরানস' এবং পৃথিবীর আদি দেবী 'গায়া'র সন্তান 'সাইক্লপস' আর 'হেকাথনকেরিস' আসলে বহু শরীরের সংযোগে গঠিত দৈত্যাকার প্রাণী বিশেষ। 'হেকাথনকেরিস' -এর ৫০টি মাথা এবং ১০০টি হাত। গ্রিসের প্রধান দেবতা 'জিউস'-এরও আগে জন্মেছে।

কয়েনে কালাপানির বন্দিশালা

সুমিত্র বন্দ্যোপাধ্যায়

৩১৫৫২, ৩১৫৪৯, ৩১৫৫৫, ১৪৭ .....। নম্বরগুলো কিসের জানেন? ১৪৭ নম্বরটা এক জন ডাকাতের। নাম ধীরেন্দ্র চৌধুরী। বোমা আর বন্দুক কেনার জন্য ডাকাতি করছিলেন। ভোটের জন্য নয়, স্বাধীনতার জন্য। তাই তাঁকে দ্বীপান্তরে পাঠানো হয়েছিল। আন্দামানের সেলুলার জেলে। এখানে বন্দীরা ছিলেন স্বদেশী ডাকাত। ৩১৫৫২ নম্বরের বন্দীর নাম উল্লাসকর দত্ত, ৩১৫৪৯ নম্বরের বন্দীর নাম বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, ৩১৫৫৫ নম্বরের বন্দীর নাম ইন্দুভূষণ রায়।

ভারতের এই একমাত্র বন্দীশালা যেটি নিয়ে মুদ্রা বার হয়েছে। একটি নয়, একাধিক। এমন বন্দীশালা এক সময় জেলখানা ছিল ঠিকই, এখন তা মন্দির। তবে সেই মন্দিরের অনেকটাই ইচ্ছাকৃত ভাবে ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। বিদেশী শাসকদের থেকে ক্ষমতা পেতে না পেতেই স্বদেশী শাসকরা ১৯৪৭ সালেই সেটি ভেঙে ফেলতে শুরু করেন। সেটিকে মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হচ্ছে এমন কথা জানাজানি হতেই অনেক সময় লেগে যায়। প্রতিবাদ করেন এরাজ্যের বিপ্লবীরা। যাঁরা এক দিন বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিলেন, তাঁরাই গর্জে উঠলেন হস্তান্তরিত ক্ষমতা পাওয়া স্বদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে। যে কারাগারের প্রাচীরে একদিন তাঁদের রক্তের ছিটে লেগেছিল চাবুকের নির্মম আঘাতে, সেই কারাগারের অনেকটাই বেঁচে গেল। বেঁচে গেল ৬৯৬ কুঠুরির সেই কারাগার যা ১৮৯৬ সালে তৈরি করা শুরু হয়েছিল। শেষ হয়েছিল ১৯০৬ সালে, মানে ক্ষুদিরাম বসুর ফাঁসির আরও বছর দুয়েক আগে।

তবে ইতিহাসটা এখানেই শেষ নয়। মাঝে আরও একটা পর্ব আছে। সদ্য সেই পর্বের ৭৫ বছর পূর্ণ হয়েছে। বাঁদিকের কোণে ইউনিয়ন জ্যাকের শৃঙ্খল নেই এমন পতাকা দেশের মাটিতে প্রথম উড়েছিল আন্দামানেই। আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বময় কর্তা নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু সেই পতাকা তুলে দুই প্রধান

দ্বীপের নাম রেখেছিলেন শহিদ ও স্বরাজ। সুভাষচন্দ্র যেখানে কারাবন্দী ছিলেন সেই বর্মা মুলুক থেকে আনা ইঁট দিয়েই তৈরি হয়েছিল কালাপানির এই বন্দীশালা।

১৯৯৭ সালে আন্দামানের এই জেল নিয়ে প্রথম মুদ্রা বার হয়েছিল সাধারণের ব্যবহারের জন্য। স্টেনলেস স্টিলের এক টাকার মুদ্রা। দেশের চারটি টাঁকশাল থেকেই এই মুদ্রা বের হয়েছিল। তাতে দেবনগরী ও রোমান হরফে লেখা ছিল CELLULAR JAIL, PORT BLAIR ও ১৯৯৭ সাল। ওজন ৪.৮৮ গ্রাম, ব্যাস ২৫ মিলিমিটার। এটির বেধ দেড় মিলিমিটারের সামান্য বেশি। ১৯৪৩ সালের ২৯ ডিসেম্বর এখানে এসেছিলেন নেতাজী। দেশের একটি ভূখণ্ড তখন ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত হয়েছে। জাপানিরা সেখান থেকে ব্রিটিশদের বিতাড়িত করার পরে সেখানে ভারতের ভূখণ্ডে উড়েছিল স্বাধীনতার পতাকা। তার স্মরণে যে ৭৫ টাকার স্মারক মুদ্রাটি বের হয় সেটিতেও রয়েছে সেলুলার জেলের ছবি। ৩৫ গ্রাম ওজনের এই মুদ্রাটিতে অর্ধেক ওজনের রুপো রয়েছে। এটি ৪২ মিলিমিটার ব্যাসের, বেধ আড়াই মিলিমিটার। এটিকে অভিবাদনরত নেতাজির প্রতিকৃতিও রয়েছে সেলুলার জেলের পাশাপাশি।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক অশ্রুসজল অধ্যায় ‘সেলুলার জেল’। ইংরেজদের নৃশংস অত্যাচারের সাক্ষী এই ‘সেলুলার জেল’। ১৯০৬ সালে এই কারাগারটির নির্মাণ শেষ হয়। বটুকেশ্বর দত্ত, উল্লাসকর দত্ত, দামোদর সাভারকারের মত বহু বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী এই কারাগারে বন্দী ছিলেন।

অবরুদ্ধ ইতিহাস

ডাঃ সুকান্ত মুখোপাধ্যায়

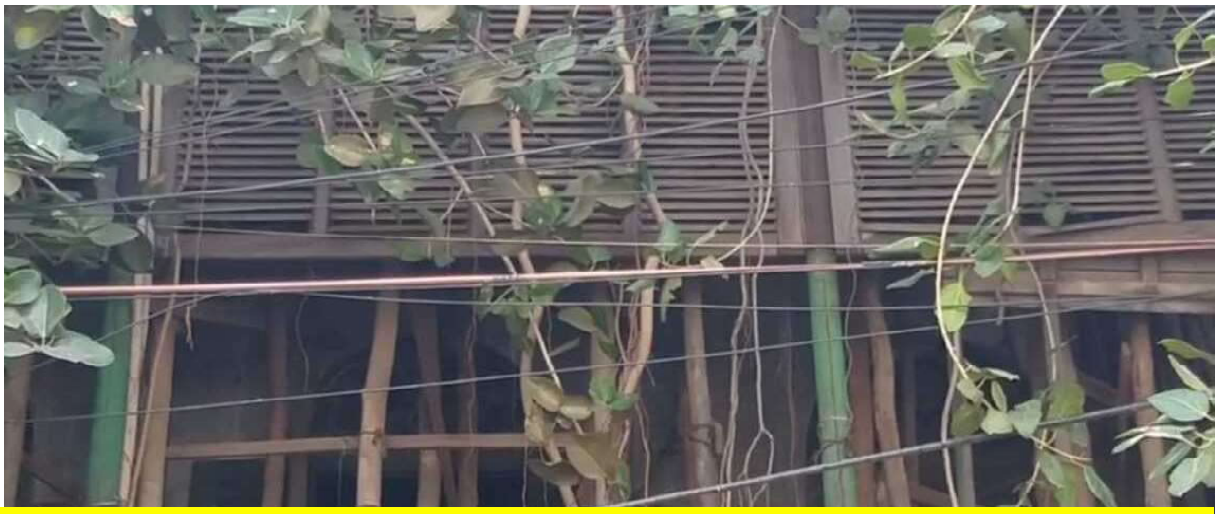

৪নং নিত্যধন মুখার্জী রোডের বাড়িটির বর্তমান জীর্ণ অবস্থার ছবি

আদি ঠিকানা ৪নং তেলকল ঘাট রোড কারণ তেলকল ঘাটেই ছিল জেসপ কোম্পানির তেলের কল, সে অনেককাল আগেকার কথা। অনেক পরে এবাড়ির নতুন ঠিকানা হয় ৪নং নিত্যধন মুখার্জী রোড। হাওড়ার স্বাধীনতা সংগ্রামের এবং শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস এবাড়ির পরতে পরতে জড়িয়ে আছে। কে না এসেছেন এখানে! সুভাষচন্দ্র বসু তো বটেই, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রবোধচন্দ্র বসু, বিপিন বিহারী বসু, বরদাপ্রসন্ন পাইন, বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, হরেন্দ্রনাথ ঘোষ, দীনবন্ধু এন্ড্রুজ, অগম দত্ত, জীবন মাইতি, নিতাই মন্ডল, বিভূতি ঘোষ, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, রামচন্দ্র শর্মা প্রমুখ বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামীবৃন্দ। অসংখ্য গুপ্ত মিটিং, আলোচনা, আন্দোলনের রূপরেখা তৈরী, ভবিষ্যৎ আন্দোলনের পরিকল্পনা এমনকি ১৯৩০ সালে লবণ আইন আন্দোলনের অভিযানের সূচনা সব কিছুই হয়েছে এই বাড়িতে। পুলিশের বিষ নজরে থাকায় বার বার পুলিশি অভিযান হয়েছে ধরপাকড়ও হয়েছে, বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় সেসব প্রকাশিতও হয়েছে।

বাড়ির বয়স নির্ধারণ করা খুব কঠিন। আপাতত জীর্ণ কারণ বহুদিন সংস্কার হয় নি, করার মত কোন দলের আর্থিক পরিস্থিতিও ছিল না। যেটুকু যা হয়েছিল তা বিশেষ প্রয়োজনে।

হাওড়ায় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আগে কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন বরদাপ্রসন্ন পাইনের পিতা প্রখ্যাত আইনজীবি অমৃতলাল পাইন। সেসময় তাঁর বাড়ি থেকেই কংগ্রেসের কাজকর্ম পরিচালিত হত। খুব মজবুত সংগঠন তখন ছিল না, কংগ্রেসের দলাদলিও খুব একটা ছিল না। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের অনুরোধে শরৎচন্দ্র সাহিত্যিক হলেও কংগ্রেসের সভাপতি হতে রাজি হন। সেই সময় বিশিষ্ট বন্ধু ও গুণগ্রাহী অধর চট্টোপাধ্যায় এই বাড়িটি কংগ্রেসের অফিস হিসেবে ব্যবহার করার জন্য সামান্য ভাড়ায় দিয়েছিলেন। অধরবাবুরা বহু সম্পত্তির মালিক ছিলেন। তাঁদের উলুবেড়িয়া, তারকেশ্বরে জমি ও কারখানা ছিল এমনকি পরবর্তীকালে সেন পন্ডিত স্টেবিলাইজার কারখানাও তাঁদেরই ছিল। কালীকুন্ডু লেনের পেট্রোল

পাম্পের উল্টোদিকে নিধিরাম মাঝি লেনে দিয়ে ঢুকে যে চৌমাথা পড়ে তারই সামনে এখনও তাঁদের একটি বসতবাটি আছে।

শরৎচন্দ্রের আমল থেকেই হাওড়া কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এবং কর্মীরা নিয়মিত এই বাড়িতে যাতায়াত শুরু করেন। ১৯২১ সালে গান্ধী পুণ্যাহ অনুষ্ঠিত হয় হাওড়া টাউন হলে কিন্তু তার যাবতীয় পরিকল্পনা হয়েছিল এই বাড়ি থেকেই। এরপর বিলাতি বস্ত্র বর্জন, মাদক বিরোধী আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন সহ অজস্র আন্দোলনের রূপরেখা তৈরী হয়েছিল এই বাড়িতেই। ১৯২৮ সালে লিলুয়ায় এক শ্রমিক ধর্মঘট হয়। তার কারণ ছিল রেলকর্তৃপক্ষ বহু শ্রমিককে বিনা কারণে কর্মচ্যুত করেন। এর প্রতিবাদে যে আন্দোলন হয় তার নেতৃত্বে ছিলেন সুভাষচন্দ্র বোস, মৃণাল কান্তি বসু, কিরণচন্দ্র মিত্র (জটাধারী বাবা), শিবনাথ ব্যানার্জী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। আন্দোলনের রেশ বহুদিন পর্যন্ত চলেছিল এবং আশ্চর্য ব্যাপার রাশিয়া থেকে রেড লেবার ইউনিয়ন সংগ্রামী কর্মীদের জন্য আর্থিক সাহায্য পাঠিয়েছিল। এই বাড়িতে কংগ্রেসের ট্রেড ইউনিয়ন ও ইষ্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ে ইউনিয়নেরও সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হত। ১৯৩০ সালে বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের নেতৃত্বে হাওড়া জেলার সত্যাগ্রহীরা এই বাড়ি থেকেই পায়ে হেঁটে শ্যামপুরের শিবগঞ্জ পর্যন্ত গিয়ে লবণ আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ১৯২৮ সালে জেল বন্দীদের মুক্তির পর শরৎচন্দ্রের উদ্যোগে তাঁদের যে সম্বর্ধনার আয়োজন করা হয় তার পরিকল্পনাও করা হয়েছিল এই বাড়ি থেকেই। ১৯২৯ সালে অমর শহীদ যতীন দাসের মরদেহ নিয়ে এসে রাখা হয় হাওড়া টাউন হলে। সারারাত গোটা জেলা থেকে মানুষ এসে তাঁদের শ্রদ্ধা জানিয়ে যান। সুভাষচন্দ্রসহ কংগ্রেসের বিশিষ্ট নেতবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। পরদিন যে শোকমিছিল বের হয় তারও পরিকল্পনা এই বাড়িতেই হয়েছিল। সুভাষচন্দ্র, অমৃতা কাউর-কে হাওড়া টাউন হলে যে নাগরিক সম্বর্ধনা দেওয়া হয়েছিল তারও রূপরেখা তৈরী হয়েছিল এই বাড়িতেই।

১৯৩৬ সালে শরৎচন্দ্র কংগ্রেস সভাপতি পদে ইস্তফা দেন। এরপর কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হন হরেন্দ্রনাথ ঘোষ। সম্পাদক হন সুধীর মুখার্জী। কংগ্রেসের কার্যালয় স্থানান্তরিত হয় ৩১/৪ বৈকুণ্ঠ চ্যাটার্জী লেনের বাড়িতে। কিন্তু এই বাড়িতে থেকে যায় কংগ্রেস সোশালিস্ট পার্টির অফিস ও অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়ন অফিসগুলি যেগুলি থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হত। দীর্ঘদিন এখানে কংগ্রেসের অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়নের অফিস ছিল। ১৯৫৩ সালে প্রজা সোশালিস্ট পার্টির দপ্তরও এই বাড়িতেই ছিল। ১৯৭৭ সালে জনতা পার্টি গঠন হলে তার অফিস এই বাড়িতেই থেকে যায়। তখন ভাড়া ছিল ৫০ টাকা। কিন্তু ভাড়া বাকি ছিল প্রায় ১৪ বছর। ১৯৮৫ সালে অধরবাবুর উত্তরাধিকারী শৈলপূর্ণ চট্টোপাধ্যায় মারা যাওয়ার আগে ১৪ বছরের বকেয়া ভাড়া মিটিয়ে দেওয়া হয় কিন্তু ১৯৯৩ সালে বাড়িটি একটি বেসরকারী সংস্থাকে বিক্রি করে দেওয়া হয়। বাড়িটি রক্ষা করারা জন্য আন্দোলন শুরু হয় এবং হাইকোর্টে মামলাও দায়ের হয়। ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গ হেরিটেজ কমিশনের কাছেও বাড়িটিকে রক্ষা করার জন্য আবেদন করা হয়। এই সংরক্ষণের কাজে বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছিলেন অর্ধেন্দু বসু, নিমাই দত্ত, সুকুমার বসু প্রমুখ বিশিষ্ট নাগরিক বৃন্দ। সংরক্ষণের কারণ হিসাবে উপযুক্ত প্রমাণপত্র চেয়েছিল হেরিটেজ কমিশন এবং প্রমাণ পাওয়ার পরই ২০১২ সালে হেরিটেজ কমিশন এই বাড়িটি সংরক্ষণের আওতাভুক্ত করে। কিন্তু এরপরেও ৭ই ফেব্রুয়ারী ২০১৪ সালে শৈলেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণ সান্যাল, নিমাই দত্ত, ডাঃ রামকৃষ্ণ ঘোষমন্ডল প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দ কোলকাতা হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেন। ইতিমধ্যে হেরিটেজ কমিশন-এর উদ্যোগে বাড়িটিকে হেরিটেজ ঘোষণা করে একটি বোর্ড লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাড়ির সামনে একটি বড় টিনের বোর্ডও লাগানো হয়েছে।

এখন দেখার কবে এই অবরুদ্ধ ঐতিহাসিক বাড়িটি বন্দীদশা থেকে মুক্ত হয়ে আমাদের জেলার ঐতিহ্যের স্মারক-এ পরিণত হয়।

(ব্যক্তিগত সংগ্রহে থাকা নথিপত্র ছাড়াও বহু তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন শ্রী রামচন্দ্র শর্মা ও শ্রী নির্মল ঘোষাল মহাশয়, এজন্য তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ)

নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু এবং মান্দালয় জেল

সুরজিৎ দাস

''ভারতবর্ষ ভগবানের বড় আদরের স্থান, এই মহাদেশে লোকশিক্ষার নিমিত্ত ভগবান যুগে যুগে অবতার রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া পাপক্লিষ্টা ধরণীকে পবিত্র করিয়াছেন এবং প্রত্যেক ভারতবাসীর হৃদয়ে ধর্মের ও সত্যের বীজ রোপন করিয়া গিয়াছেন। ভগবান মানবদেহ ধারণ করিয়া নিজের অংশাবতার রূপে অনেক দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু এতবার তিনি কোনো দেশে জন্মগ্রহণ করেন নাই - তাই বলি আমাদের জন্মভূমি ভারতমাতা ভগবানের বড় আদরের দেশ''। — নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু

ভারতমাতার বন্দী দশা মুক্ত করতে ১১বার বন্দী হয়েছেন ব্রিটিশদের কারাগারে। তিনি আমাদের সুভাষচন্দ্র বসু, যিনি নেতাজী নামেই সমধিক পরিচিত। ভারতমায়ের এই বীর সন্তান সিভিল সার্ভিসের পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকার করেও ব্রিটিশ সরকারের গোলামী করেননি।

এই বন্দীজীবনের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য মান্দালয় জেলে বন্দীদশা। তিনি এই জেলে ১৯২৪ থেকে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত বন্দী ছিলেন। বর্মার এই জেল ছিল বাস্তবের নরক। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, নিচুমানের খাবার, এক অন্ধকার কুঠী ঘর সূর্যের আলো যেখানে প্রবেশ করে না, মৃত্যু যেখানে হাতছানি দেয়। কিন্তু সুভাষচন্দ্র জেলে আটক হয়েও নিজের কাজ বন্ধ করলেন না। দেশাত্মবোধ যাঁর অন্তরের চালিকাশক্তি তাঁকে রুখবে কে? তিনি শুরু করলেন অনশন। যদিও তিনি এর আগে কলকাতার প্রেসিডেন্সি জেলেও এই নিচুমানের খাবারের জন্য প্রতিবাদ করেছিলেন যা ব্রিটিশ সরকার কানে নেয়নি।

কিন্তু এবার তিনি ব্রিটিশ সরকারের মত দিলেন বদলে। এরপর ১৯২৫ সালে তাঁর রাজনৈতিক গুরু চিত্তরঞ্জন দাশ পরলোকগমন করেন। জেলে বন্দী থাকাকালীন এ খবর পেয়ে তিনি শোকস্তব্ধ। বর্মার বন্দীশালায় ১৯২৪ থেকে ১৯২৭ এর মধ্যে সুভাষ যেন শিষ্যত্ব থেকে নেতৃত্বে উত্তীর্ণ হলেন। এই দীর্ঘ চার বছর তিনি মেজদাদা শরৎ বসু, মেজবৌদি বিভাবতী বসু, বন্ধু দিলীপ রায় (লেখক দিজেন্দ্রলাল রায়ের পুত্র), লেখক শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখদের সঙ্গে চিঠির দ্বারা যোগাযোগ রাখতেন। এই চিঠিপত্রে সুভাষচন্দ্র শিল্পকলা, সঙ্গীত, সাহিত্য, প্রকৃতি, শিক্ষা, লোকসঙ্গীত, নগর, উন্নয়ন, অপরাধতন্ত্র, অধ্যাত্মবাদ এবং অবশ্যই রাজনীতি বিষয়ে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন। কারাবাসের দুঃখকষ্টকে রঙ্গ করে নির্বিকার চিত্তে এবং সকৌতুকে বলেছেন ''এখানে না এলে বোধ হয় বুঝতুম না সোনার বাংলাকে কত ভালোবাসি। আমার সময়ে সময়ে মনে হয় বোধ হয় রবিবাবু (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) কারারুদ্ধ অবস্থার কথা কল্পনা করে লিখেছিলেন 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি'''।

বর্মায় থাকাকালীন দিলীপ রায়কে ১৯২৫ সালে মে মাসের একটি চিঠিতে লিখেছিলেন ''যতদিন জেলের মধ্যে বেশ স্বাস্থ্যকর ও সামাজিক বিধি ব্যবস্থার বন্দোবস্ত না হয়, ততদিন কয়েদীর সংস্কার হওয়া অসম্ভব এবং ততদিন জেলগুলি আজকালকার মত নৈতিক উন্নতির পথে অগ্রসর না হয়ে অবনতির কেন্দ্র থাকবে''। এর থেকে স্পষ্ট হয় তৎকালীন সময়ে কারাগারের অবস্থা সুচারু ছিল না। সুভাষচন্দ্র জেলে বেশিরভাগ সময় কাটিয়েছেন বই, পত্রিকা পাঠ করে, শুধু নিজেই পাঠ করেন নি জেলের অন্য কয়েদীদেরও বই পড়তে উদ্বুদ্ধ করেছেন যার প্রমাণ - দিলীপ রায়কে লেখা উপরিউক্ত একই চিঠিতে ব্যক্ত করেছেন - ''তুমি কিছুদিন আগে যে সব বই পাঠিয়েছিলে তার সবগুলিই পেয়েছি। সেগুলি এখন ফিরে পাঠাতে পারব না কারণ তাদের অনেক পাঠক জুটেছে''। ১৯২৫ সালের ১১ সেপ্টেম্বর মেজবৌদিদি বিভাবতী বসুকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন - তিনি ঠাট্টা করে বলেছেন টেনিস কোর্টে তিনি এবং অন্য কয়েদীরা শরীরচর্চা করতেন যা না করলে তিনি বাতগ্রস্ত হয়ে বাড়ি ফিরতেন। এছাড়াও তিনি ব্যাডমিন্টনও খেলতেন। এর সাথে তিনি মান্দালয় জেলের দূর্গাপুজোর কথাও উল্লেখ করেছেন। জেলের মধ্যে তাঁর খাদ্য তালিকায় ছিল - পেঁপে, বেগুন, শাক, পাঁঠা ও মুরগী উভয় মাংস, ধোঁকার ডালনা, ছানার পোলাও, রসগোল্লা। তিনি কারাগারের বাগানে গাছ লাগাতে ব্যর্থ হন। পিঁপড়ে ও পোকার উপদ্রবে বিশেষ গাছ গজায় নি। শুধুমাত্র সূর্যমুখী ও কয়েকটি রজনীগন্ধা শেষ পর্যন্ত টিকে ছিল। এই চিঠিতে তিনি দার্জিলিং-এর অরেঞ্জ পিকো চা, ইলিশ ও চিংড়ি মাছ খাওয়ার কথাও বলেছেন। ১৯২৬ সালের ১৭ই মার্চ মেজদাদা শরৎ বসুকে লেখা চিঠিতে তিনি এক ঝড় বাদল পূর্ণ শীতল দিনের অপূর্ব বর্ণনা দিয়েছেন।

এরকমই ছিল এই মহান মানুষটির বন্দী জীবন। এর পরবর্তী সময়েও বন্দী হয়েছেন ভারতের অন্যান্য জেলে, নজরবন্দী হয়েছেন কলকাতার এলগিন রোডের বাড়িতে, কিন্তু কোনো জায়গাতেই তাঁকে ধরে রাখা যায়নি। কাটিয়েছেন আপোষহীন সংগ্রামী জীবন।

শ্রী অরবিন্দ ঃ বন্দীশালা যখন মুক্তির মন্দির

সন্দীপ বাগ

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ব্রিটিশ সরকার নির্বিচারে জেলে বন্দী রাখতেন। দ্বীপান্তরে, পাহাড়ের চূড়ায় কারাগারে বা শহরের নির্জন জেলে বন্দী রেখে তাদের ওপর চালাতেন শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার। এসবের ফলে বেশিরভাগ রাজনৈতিক বন্দীর জীবনে নেমে আসত তিলে তিলে মৃত্যুযন্ত্রণা। আবার এই বন্দী জীবনে অনেকেই পেয়েছেন মুক্তির স্বাদ জেলের নির্জন কুঠুরির মধ্যেই। বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ তাদের মধ্যে অন্যতম একজন।

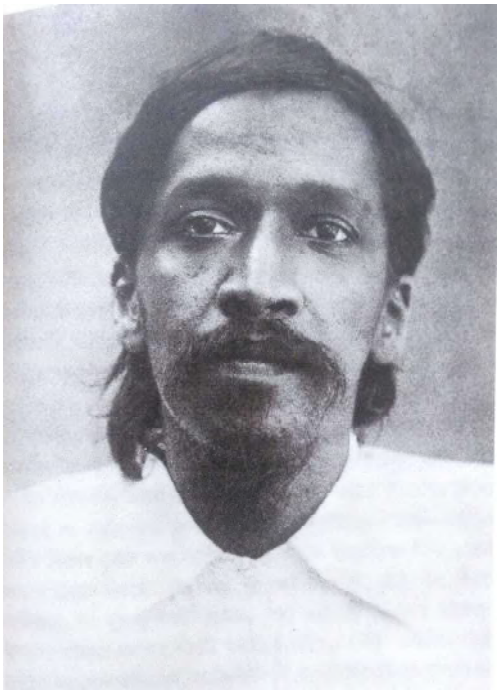

১৮৭২ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট অরবিন্দ ঘোষ কলকাতার থিয়েটার রোডের বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ডাঃ কৃষ্ণধন ঘোষ ছিলেন সিভিল সার্জেন। ইংলণ্ডের জল হাওয়ায় মানুষ। চাইতেন তার পুত্ররা যেন বাংলা না শেখে বা ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত না হয়। সেজন্যই ছোট বয়সে অরবিন্দকে পাঠিয়ে দেওয়া হল দার্জিলিং-এ আইরিশ নানদের স্কুলে এবং ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র সাত বছর বয়সে অন্য দুইভাই এর সঙ্গে রেখে এলেন ইংলণ্ডে এক পাদ্রী ও তাঁর স্ত্রীর তত্ত্বাবধানে। সেই পাদ্রীকে কঠোর নির্দেশ দিয়েছিলেন যে তাদের যেন কোন ভারতীয়দের সঙ্গে পরিচয় না হয় এবং তাদের ওপর কোন ভারতীয় প্রভাব না পড়ে। এই নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালিত হয়েছিল। ফলে অরবিন্দ বড় হতে থাকলেন ভারতবর্ষ এবং তার মানুষ, ধর্ম, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থেকে। এরপর ইংলণ্ডে লেখাপড়া করে ২১ বছর বয়সে পরিণত হয়ে বরোদায় ফেরা, কলেজে ইংরেজী ও ফার্সীর অধ্যাপনা চলছিল বেশ। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন তাঁর জীবন করে দিল ওলটপালট। ভারতীয় সভ্যতার ঐতিহ্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হলেন, পশ্চিমী সভ্যতা যে কত ঠুনকো সেটা জানলেন ক্রমে। শুরু করলেন যোগ সাধনা। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে বরোদা থেকে কলকাতায় এসে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী অন্দোলনে যোগ দিলেন। রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে সম্পূর্ণ ভারতীয়দের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত 'বেঙ্গল ন্যাশানাল কলেজ'- এর অধ্যক্ষ হলেন। ইংরেজদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে আবেদন নিবেদনের নরমপন্থী পথ ছেড়ে দিয়ে গুপ্ত সমিতি গড়ে সশস্ত্র আন্দোলনের ডাক দিলেন। ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে আয়ারলণ্ডের 'শিনফিন'-এর সশস্ত্র আন্দোলন তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল। ১৯০৭ সালের কংগ্রেসের সুরাট অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব করেন এবং সদস্যদের তুমুল বিবাদে কংগ্রেস ভেঙে দু'টুকরো হয়ে যায়। ১৯০৮ সালের ১লা মে ভোর রাতে তিনি ও তাঁর ভাই বারীন্দ্র ঘোষ ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে নানারকম ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন এই অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯০৯ সালের ৬ই মে তিনি সব অভিযোগ থেকে মুক্ত হয়ে আলিপুর জেল থেকে ছাড়া পান। এই একবছরের কারাবাস তাঁর জীবনকে সম্পূর্ণ রূপে পালটে দিল। বিপ্লবী অরবিন্দ জেল থেকে বেরোলেন ঋষি অরবিন্দ হয়ে। জেলের মধ্যে পেলেন ঈশ্বরের সন্ধান। অরবিন্দের জীবনের এই পরিবর্তন বর্ণনার চেষ্টা থাকবে আলোচ্য প্রবন্ধে।

গ্রেফতার হবার পর থেকে ছাড়া পাওয়া অবধি অরবিন্দের জীবনের ঘটনাবলীর সন্ধান পাওয়া যায় শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পন্ডিচেরী থেকে প্রকাশিত 'কারাকাহিনী' গ্রন্থে। ১৯০৯ সালের ৩০শে মে উত্তরপাড়ায় প্রদত্ত এক ভাষণে তিনি প্রকাশ্যে জেলের মধ্যে ঈশ্বরলাভের কথা প্রথম জানালেন। কারাজীবনের কষ্ট এবং এটিকে অতিক্রম করে শ্রীভগবানের উপলব্ধির কথা 'কারাকাহিনী' গ্রন্থ ও উত্তরপাড়ার ভাষণ থেকে আলোচনা করার চেষ্টা করব।

শ্রীঅরবিন্দ

কারাকাহিনী

(১) বন্দী জীবনের অত্যাচার ঃ

বিলেতে বড় হওয়া, উচ্চবর্গীয়, উচ্চশিক্ষিত সম্মানীয় ব্যক্তি হিসেবে অরবিন্দ ঘোষকে যখন গ্রেফতার করা হল এবং জেলের মধ্যে চোর ডাকাতের সঙ্গে সমমর্যাদায় রাখা হল স্বভাবতই তিনি অত্যন্ত কষ্ট পেলেন। গ্রেফতারের দিন বাড়িতে সকাল সাড়ে পাঁচটা থেকে বেলা সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত ব্রিটিশ পুলিশ তন্ন তন্ন করে তল্লাশি চালায়। একটি ছোট বাক্সে দক্ষিণেশ্বর থেকে আনা মাটি ছিল, সেটা তেজস্ক্রিয় কিনা তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে। তারা কি করে বুঝবে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের মাটির ক্ষমতা। উচ্চবর্গীয় হয়েও অরবিন্দ কেন মাটিতে শুয়ে থাকেন, কেন বড়লোকের জীবন যাপন করেন না, স্বার্থ ত্যাগ, দেশহিতৈষিতা ইত্যাদি বিষয়ে মানসিক অত্যাচার শুরু হয়। লালবাজারে চারদিন বিনা স্নানে, জেরবার হয়ে কোর্টের আদেশে আলিপুর জেলে নিয়ে যাওয়া হল। অরবিন্দ লিখেছেন — 'আমরা জেলে গিয়া, ... চারদিন পর স্নান করিয়া স্বর্গসুখ অনুভব করিলাম, ... আমার নির্জন কারাগারে ঢুকিলাম, ক্ষুদ্র ঘরের গরাদ বন্ধ হইল। ৫ই মে আলিপুর কারাবাস আরম্ভ। পর বৎসর ৬ই মে নিস্কৃতি পাই'।

কেমল ছিল জেল জীবন? 'আমার নির্জন কারাগৃহটি নয় ফুট দীর্ঘ, পাঁচ ছয় ফুট প্রস্থ ছিল। ইহার জানালা নাই। ঘরের বাইরে একটি ক্ষুদ্র উঠান, পাথরের জমি, ইঁটের উচ্চ দেওয়াল, সামনে কাঠের দরজা। কারাগৃহের সাজ সরঞ্জাম বলিতে একখানা থালা, একটি বাটি, একটি স্নানের বালতি, (পানীয়) জলের জন্য একটি নলাকার বালতি এবং দুটি কম্বল। এই একটি বাটিতেই জল নিয়ে শৌচক্রিয়া করিলাম, সেই বাটিতেই মুখ ধুইলাম, স্নান করিলাম, অল্পক্ষণ পরে আহার করিতে হইল, সেই বাটিতেই ডাল বা তরকারী দেওয়া হইল, সেই বাটিতেই জলপান করিলাম এবং আচমন করিলাম। এমন সর্বকর্মক্ষম মূল্যবান বস্তু ইংরেজের জেলেই পাওয়া সম্ভব। বাটি আমার এই সকল সাংসারিক উপকার করিয়া যোগসাধনের উপায় স্বরূপও হইয়া দাঁড়াইল। ঘৃণা পরিজ্ঞানের এমন সহায় ও উপদেষ্টা কোথায় পাইব?' মকদ্দমার আসামীদের এক বালতি জলেই শৌচক্রিয়া, বাসনমাজা ও স্নান সম্পন্ন করতে হত, কয়েদীদের দু-চার বাটির জলেই স্নান করতে হত। ক্ষুদ্র কুঠুরিতে বাতাসের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল, অবাধে উগ্র ও প্রখর রোদ প্রবেশ করায় সেটি উত্তপ্ত উনুনের মত হয়ে উঠত। উনুনে সিদ্ধ অবস্থায় জল তৃষ্ণা মেটাবার জন্য টিনের উষ্ণ জল পান করতে হত। এই তপ্ত ঘরে জেলের কয়েদীদের তৈরী দুটি মোটা কম্বলই ছিল বিছানা। একটা পেতে, অন্যটাকে বালিস হিসেবে ব্যবহার করতে হত। বৃষ্টি জলে একটু আরাম হত বটে তবে ঝড়ে ধুলো, পাতার সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে জল প্রবেশ করায় গোটা মেঝে ভিজে থাকত। সারারাত ঘরের এককোণে ভিজে কম্বল নিয়ে বসে থাকা ছাড়া উপায় ছিল না। তবু ঝড় বৃষ্টিকে তিনি আমন্ত্রণ জানাতেন।

জেলের আহার কেমন ছিল? ভোর পাঁচটায় গরাদ

খোলার খানিক পরে দেওয়া হত লফসী। লফসীর অর্থ ফ্যানের সঙ্গে সিদ্ধ ভাত। কখনো এটা চাল ডাল দিয়ে খিচুড়ির মত করা হত। কখনো বা অল্প গুড় এর সঙ্গে মেশানো হত। দুপুরে দেওয়া হত — 'মোটা ভাত, তাহাতে খোলা, কাঁকড়, পোকা, চুল, ময়লা ইত্যাদি মশলা দেওয়া — স্বাদহীন ডালে জলের ভাগ অধিক, তরকারীর মধ্যে ঘাস-পাতা সমেত শাক। মানুষের আহার যে এত স্বাদহীন ও নিঃসার হইতে পারে, তাহা আমি আগে জানিতাম না।' প্রহরে প্রহরে প্রহরীদের হাঁক ডাক রাতের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাতো। শরীর ও মনের ওপর অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করতে করতে অরবিন্দের জেল জীবন কাটছিল। আসামীদের অনর্থক অসুবিধা ও নানা কষ্টকে অরবিন্দ জেল প্রণালীর দোষ হিসেবে দেখেছেন — 'এই সকল কষ্ট জেলের কাহারও ব্যক্তিগত নিষ্ঠুরতা বা মনুষ্যোচিত গুণের অভাবে হয় নাই। বরং আলিপুর জেলে যাঁহাদের উপর কর্ত্তৃত্বের ভার ছিল, তাঁহারা সকলেই অতিশয় ভদ্র, দয়াবান এবং ন্যায়পরায়ণ।' স্থানীয় কতৃপক্ষ চাইতেন যাতে জেলে কয়েদীদের যন্ত্রণা কম হয়, ইউরোপীয় জেল প্রণালীর অমানুষিক বর্বরতা দয়ায় এবং ন্যায়পরায়ণতায় লঘুকৃত হয়। সুসভ্য ব্রিটিশ রাজত্বে মোকদ্দমার আসামীর জন্য কি অদ্ভুত ব্যবস্থা এবং নির্দোষীদের দীর্ঘকালব্যাপী যে সব যন্ত্রণা ভোগ করতে হত, তার একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা আমরা পেলাম আগের বর্ণনায়।

(২) বন্দীজীবন আনন্দের দিশা ঃ

অরবিন্দ লিখছেন — 'আমরা সকলে ভদ্রলোকের সন্তান, অনেক জমিদারের ছেলে, কয়েকজন বংশে, বিদ্যায়, গুণে, চরিত্রে ইংলণ্ডের শীর্ষস্থানীয় লোকের সমকক্ষ।' ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগের ভিত্তিতে বিনা প্রমাণে ধৃতদের চোর ডাকাতের মত রাখা — 'চোর, ডাকাত কেন, পশুর ন্যায় পিঞ্জরে রাখিয়া পশুর অখাদ্য আহার খাওয়ান, জলকষ্ট, ক্ষুৎপিপাসা, রৌদ্র, বৃষ্টি, শীত, সহ্য করান — ইহাতে ব্রিটিশ রাজপুরুষদের ও ব্রিটিশ জাতির গৌরব বৃদ্ধি হয় না। ইহা কিন্তু তাঁহাদের জাতীয় চরিত্রগত দোষ।' এই অত্যাচার সত্ত্বেও জেলের মধ্যে অরবিন্দ কষ্টকে অতিক্রম করতে সমর্থ হলেন। এখানে জেনে রাখা দরকার ১৯০২ সাল থেকে অরবিন্দ ঘোষ ভারতীয় যোগসাধনা, ধ্যানের প্রতি আকৃষ্ট হন। বিভিন্ন গুরুর কাছে এই বিদ্যা রপ্ত করেন। নানা কাজের চাপে নির্জনে ধ্যান বা যোগসাধনা করার সুযোগ পাচ্ছিলেন না। নির্জন কারাগার তাঁকে সমস্ত দুঃখ ভুলে যোগসাধনা করতে উৎসাহিত করল। লিখলেন — 'কারাবাসের পূর্বে আমার সকালে এক ঘন্টা ও সন্ধ্যাবেলায় এক ঘন্টা ধ্যান করিবার অভ্যাস ছিল। এই নির্জন কারাবাসে আর কোন কার্য না থাকায় অধিককাল ধ্যানে থাকিবার চেষ্টা করিলাম'। এবং প্রথম প্রথম মন

বিদ্রোহী, দেহ অবসন্ন হয়ে পড়লেও অনেক চেষ্টা ও অধ্যাবসায়ে ধীরে ধীরে ধ্যানরাজ্যে প্রবেশ করল মন। ক্রমাগত ধ্যান করার ফলে — 'আমার সমস্ত অন্তঃকরণে হঠাৎ এমন শান্তি প্রসারিত হইল, সমস্ত শরীরময় এমন শীতলতা ব্যপ্ত হইতে লাগিল, উত্তপ্ত মন এমন স্নিগ্ধ, প্রসন্ন ও পরম সুখী হইল যে, পূর্বে এই জীবনে এমন সুখময় অবস্থা অনুভব করিতে পারি নাই। শিশু মাতৃক্রোড়ে যেমন আশ্বস্ত ও নির্ভীক হইয়া শুইয়া থাকে, আমিও যেন বিশ্বজননীর ক্রোড়ে সেইরূপ শুইয়া রইলাম। এই দিনই আমার কারাবাসের কষ্ট ঘুচিয়া গেল। ইহার পরে কয়েকবার বদ্ধাবস্থায় অশান্তি, নির্জন কারাবাস ও কর্মহীনতায় মনের অশান্তি, শারীরিক ক্লেশ বা ব্যাধি, যোগান্তর্গত কাতর অবস্থা ঘটিয়াছে, কিন্তু সে দিনে ভগবান এক মূহুর্তে অন্তরাত্মায় এমন শক্তি দিলেন যে এই সকল দুঃখ মনে আসিয়া ও মন থেকে চলিয়া যাইবার পরে কোন দাগ বা চিহ্ন রাখিতে পারিত না, দুঃখের মধ্যেই বল ও আনন্দ উপভোগ করিয়া বুদ্ধি মনের দুঃখকে প্রত্যাখ্যান করিতে সক্ষম হইত। সেই দুঃখ পদ্মপত্রে জলবিন্দুবৎ বোধ হইত।' এখন থেকে সর্বভূতে ঈশ্বরের উপস্থিতি উপলব্ধি করলেন অরবিন্দ ঘোষ। যিনি ইউরোপ থাকাকালীন ভগবানের অস্তিত্বকে অস্বীকার করতেন।

জেলখানায় একদিকে কারখানা ও অন্যদিকে গোয়ালঘর পর্যন্ত রোজ হাঁটতে হাঁটতে — 'উপনিষদের গভীর ভাবোদ্দীপক অক্ষয় শক্তিদায়ক মন্ত্র উচ্চারণ করিতাম, না হয় কয়েদীদের কার্যকলাপ ও যাতায়াত লক্ষ্য করিয়া সর্বঘটে নারায়ণ এই মূল সত্য উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতাম। বৃক্ষে, গৃহে, প্রাচীরে, মনুষ্যে, পশুতে, পক্ষীতে, ধাতুতে, মৃত্তিকায় 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' - মনে মনে এই মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক সর্বভূতে সেই উপলব্ধি আরোপ করিতাম। এই রূপ করিতে করিতে এমন ভাব হইয়া যাইত যে, কারাগার আর কারাগর বোধ হইত না। সেই উচ্চপ্রাচীর, সেই লোহার গরাদ, সেই সাদা দেওয়াল, সেই সূর্যরশ্মিদীপ্ত নীলপত্রশোভিত বৃক্ষ, সেই সামান্য জিনিষপত্র যেন আর অচেতন নহে, যেন সর্বব্যাপী চৈতন্যপূর্ণ হইয়া সজীব হইয়াছে, তাহারা আমাকে ভালবাসে, আমাকে আলিঙ্গন করিতে চায়, এইরূপ বোধ হইত। .... বোধ হইত যেন ভগবান বৃক্ষতলে আনন্দের বংশী বাজাইতে দাঁড়াইয়াছেন। ... এই ভাব বিকাশে আমার সমস্ত মনপ্রাণ অধিকার করিয়া কি এক নির্মল মহতী শান্তি বিরাজ করিতে লাগিল, তাহার বর্ণনা করা যায় না। প্রাণের কঠিন আচরণ খুলিয়া গেল এবং সর্বজীবের উপর প্রেমের স্রোত বহিতে লাগিল। প্রেমের সহিত দয়া, করুণা, অহিংসা ইত্যাদি সাত্ত্বিক ভাব আমার রজঃপ্রধান স্বভাবকে অভিভূত করিয়া .... গভীর শান্তিভাব ও নির্মল আনন্দ গভীর হইল। মোকদ্দমার দুশ্চিন্তা প্রথম হইতে দূর হইয়া গিয়াছিল, এখন বিপরীত ভাব মনে স্থান পাইল। ভগবান মঙ্গলময়, আমার মঙ্গলের জন্যই আমাকে কারাগারে আনিয়াছেন, নিশ্চই কারামুক্তি ও অভিযোগ খন্ডন হইবে।' এরপর থেকে কারাগার হয়ে উঠল আনন্দপীঠ, জেলের কোন কষ্টই আর কষ্ট নয়, নিত্য আনন্দস্বরূপ।

(৩) জেলের সর্বত্র শ্রীভগবানের নিত্য উপস্থিতি ঃ

নির্জন কারাগার থেকে অরবিন্দকে সাধারণ কারাগারে স্থানান্তরিত করা হলে তাঁর শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা খানিকটা লাঘব হয়। উচ্চবর্গীয়, উচ্চশিক্ষিত, বিদেশে বড়

হওয়া অরবিন্দের ভারতবর্ষের নিম্নবর্গ বা সাধারণ মানুষের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ হয় নি। তাদের চিত্ত, চেতনা, ব্যবস্থার সম্পর্কে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ অজ্ঞ। কারাগারে চোর ডাকাতের সঙ্গে উচ্চবর্গীয়দের একত্রে বসবাসের সুযোগ করে দিয়ে জাতীয় ক্ষেত্রে একটা সাম্যভাবের সৃষ্টি করেছিল। অরবিন্দের মনে পড়ল - কংগ্রেসের সুরাট অধিবেশনের সময় নেতারা সাধারণ মানুষের সঙ্গে তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় একসঙ্গে ভ্রমণ করেছিলেন, দেশের দীন-দরিদ্র মানুষের সঙ্গে জাতীয় নেতাদের জীবনযাপনের ব্যবধান দূর করার জন্য। তিনি লিখেছেন — ' ক্যাম্পে নেতারা নিজেদের স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত না করিয়া সকলের সঙ্গে একভাবে একঘরে শুইতাম। ধনী, দরিদ্র, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র, বাঙালী, মারাঠী, পাঞ্জাবী, গুজরাটী দিব্য ভাতৃভাবে একই সঙ্গে থাকিতাম, শুইতাম খাইতাম।' যা জাতীয় সংহতির পক্ষে মঙ্গল হয়েছিল। একই ভাবে আলিপুর জেলে নতুন করে দেশকে চেনালো, দেশের সাধারণ মানুষের সঙ্গে রাজনৈতিক নেতৃত্বের পরিচয় করিয়া দিল। লিখলেন — 'আলিপুর জেলে বাসকালীন আমার দেশের কয়েদী, আমার দেশের চাষা, লোহার, কুমোর, ডোম-বাগদীর সমান আহার, সমান থাকা, সমান কষ্ট, সমান মান-মর্যাদা লাভ করিয়া বুঝিলাম সর্ব্বশরীরবাসী নারায়ণ এই সাম্যবাদ, এই একতা, এই দেশব্যাপী ভ্রাতৃভাবে সম্মত হইয়া যেন আমার জীবনব্রতে স্বাক্ষর দিয়াছেন।' কারাগার তাকে শেখালো সকল মানুষের মধ্যে নারায়ণের উপস্থিতির কথা। এখানে আমার আগে মানুষের মধ্যে তার ব্যক্তিগত ভালবাসা অতিশয় ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল এবং পশুপাখির ওপর ভালবাসা ছিল না। এখানে ধ্যান, যোগসাধনা একাধারে চিন্তার ধারাকে মুক্ত করে সমস্ত জাগতিক কষ্টকে তুচ্ছ করতে শেখালো, তেমনি শেখালো সবধরণের মানুষ, পশু-পাখি, কীটপতঙ্গকে ভালবাসতে। প্রত্যেক সজীব ও নির্জীব বস্তুর মধ্যে শ্রীভগবানের অস্তিত্ব অনুভব করলেন তিনি। জেলের সর্বস্তরের কর্মচারীদের সঙ্গে সুব্যবহারের ফলে বইপত্র আমদানির সুযোগ হল। প্রত্যেকের সংগৃহীত বই নিয়ে গড়ে উঠেছিল একটি ক্ষুদ্র লাইব্রেরী। গীতা, উপনিষদ, বিবেকানন্দ রচনাবলী, রামকৃষ্ণ কথামৃত ও জীবনীচরিত, পুরাণ, স্তবমালা, ব্রহ্মসঙ্গীত, বঙ্কিম রচনাবলী, স্বদেশী গানের বই, ইউরোপীয় দর্শন, ইতিহাস ও সাহিত্য বিষয়ক বই এর সম্ভার গড়ে উঠেছিল। বইপড়া ছাড়া ফুটবল বা অন্যান্য খেলা হত। সন্ধ্যাবেলায় বসত গানের মজলিস। মকদ্দমা চলাকালীন ত্রিশ চল্লিশজন আসামীর ভবিষ্যৎ নিয়ে টানাটানি চলছিল। তারা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বা ফাঁসির ভয়কে উপেক্ষা করে সর্বদা আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে থাকত। এই পরিবেশ অরবিন্দকে আনন্দময় পুরুষের অস্তিত্ব সন্ধানে সাহায্য করেছিল।

(৪) ঈশ্বরে নিবেদিত মুক্ত পুরুষ শ্রীঅরবিন্দ ঃ

'কারাগার ও স্বাধীনতা' প্রবন্ধে অরবিন্দ লিখেছেন — মানুষ মাত্রেই বাহ্য অবস্থার দাস, বস্তুগত স্থূলজগতের অনুভূতির মধ্যেই আবদ্ধ। প্রাণের সুখ-দুঃখ বাহ্য ঘটনার প্রতিধ্বনি মাত্র। উপনিষদে বলা হয়েছে যে, জগৎস্রষ্টা স্বয়ম্ভু শরীরের দ্বার সকল বর্হিমুখী করে গড়েছেন বলে সকলের দৃষ্টি বর্হিজগতে আবদ্ধ, অন্তরাত্মাকে কেউ দেখে না। সেই ধীর প্রকৃতি মহাত্মা বিরল যিনি অমৃতের বাসনায় ভিতরে চক্ষু ফিরিয়ে আত্মাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করেছেন। মানুষের শরীরই কারাগৃহ। বাহ্যিক জড়বস্তুগত চাহিদা, কামনা, অজ্ঞানতা কারারূপ শত্রু। এই কারাবাস মনুষ্য জাতীর চিরন্তন অবস্থা। জন্ম থেকে মৃত্যু এই স্থূল চাহিদার কারাবাসে মানুষ বন্দী। অথচ সাহিত্য, ইতিহাসের পাতায়, ব্যক্তিগত

রাজনৈতিক, সামাজিক ক্ষেত্রে যুগে যুগে মানুষ বিভিন্ন ধর্মমত, দর্শনের সাহায্যে আত্মসংযম, আত্মনিগ্রহ, সুখদুঃখ-বর্জনের মাধ্যমে স্থুল সুখের আধিপত্যকে সরিয়ে অনন্ত জীবনের স্বাধীনতা ও আনন্দ লাভে সচেষ্ট হয়েছেন। চিরকাল মানুষ অস্পষ্ট ভাবে অনুভব করে আসছেন যে, স্থুল জাগতিক চাহিদাকে সরিয়ে সূক্ষ্ম আনন্দ লাভের জন্য নিত্যমুক্তি আনন্দময় পুরুষ প্রত্যেকের অন্তরে বিরাজ করছেন।

আলিপুর জেলে অরবিন্দ চোর-ডাকাত, নিম্নবর্গের মেথর ঝাড়ুদার, পানিওলা, রাঁধুনি প্রমুখের সংস্পর্শে এসে বুঝতে পারলেন এদের প্রত্যেকের অন্তর শুদ্ধ। প্রত্যেক মানুষের অন্তরে উন্নতি সম্ভব। জেলের ডাক্তার ডোল সাহেব তাঁকে বলেছিলেন — 'ভারতের ভদ্রলোক বা ছোটলোক, সমাজের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বা জেলের কয়েদী যতই দেখি ও শুনি, আমার এই ধারণা দৃঢ় হয় যে চরিত্র ও গুণে তোমরা আমাদের চেয়ে ঢের উঁচু। এদেশের কয়েদী ও ইউরোপের কয়েদীতে আকাশ পাতাল তফাৎ।' সাধুতার অহঙ্কার ত্যাগ করে নিজ সহজবদ্ধ স্থির দৃষ্টিতে আপাত চোর-ডাকাত, নেশারু, খুনি, প্রমুখের অন্তর নিরীক্ষণ করলে তাদের মধ্যেকার দেবত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। অরবিন্দ লিখছেন — 'ছয়মাস কারাবাসের পরে শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল বক্সার জেলের চোর ডাকাতের মধ্যেই সর্বঘটে নারায়ণকে দর্শন করেছিলেন বলে উত্তরপাড়ার সভায় মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছিলেন। আমিও আলিপুর জেলেই চোর ডাকাত খুনির মধ্যে সর্ব প্রথম মনুষ্য দেহে নারায়ণকে উপলব্ধি করলাম।'

জেল থেকে বেরিয়ে ১৯০৯ সালের ৩০ শে মে উত্তরপাড়ায় ধর্ম্ম-রক্ষিণী সভায় ইংরেজীতে ভাষণ দিয়েছিলেন শ্রীঅরবিন্দ। তখন তিনি আর বিপ্লবী নন, অন্তর পরিবর্তিত হয়ে পুরোপুরি ভগবানের চরণে আশ্রিত এবং মুক্ত পুরুষ। তাঁর বক্তৃতা জুড়ে শুধুই আধ্যাত্বিকতার জয়গান। বললেন — যখন আমি ধৃত হই, তাড়াতাড়ি আমাকে লালবাজার হাজতে নিয়ে যাওয়া হয়, কিছুক্ষণের জন্য আমার বিশ্বাস টলেছিল, কারণ ভগবানের ইচ্ছার প্রকৃত মর্ম্ম কি তা আমি তখন বুঝতে পারি নি। সেইজন্য আমি নিমেষের তরে বিচলিত হয়েছিলাম, হৃদয়ের মধ্যে তাঁকে ডেকে বলেছিলাম, 'আমার একি হল? আমি ভেবেছিলাম আমার দেশবাসীর জন্যে আমার একটা কাজ করবার আছে, যতদিন না সে কাজ সিদ্ধ হয় ততদিন তুমিই আমাকে রক্ষা করবে। তাহলে আমি এখানে কেন, আমার বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ কেন?' একদিন গেল, দু'দিন গেল, তিনদিন গেল তখন ভিতর থেকে একটা স্বর শুনতে পেলাম — 'অপেক্ষা কর, কি হয় দেখ'। তখন আমি শান্ত হলাম, অপেক্ষা করতে লাগলাম। আমাকে লালবাজার থেকে আলিপুর নিয়ে যাওয়া হল এবং এক মাসের জন্যে মানুষের কাছ থেকে সরিয়ে একটা নির্জ্জন সেলে আবদ্ধ রাখা হল। সেখানে আমার ভেতরে ভগবানের বাণী শোনবার জন্য দিবারাত্র অপেক্ষা করতে লাগলাম। এই নির্জ্জন বাসেই এল আমার সর্বপ্রথম অনুভূতি, প্রথম শিক্ষা। তখন আমার স্মরণ হল, আমার গ্রেফতার হবার একমাস বা তারও কিছু আগে আমার প্রতি একটা আহ্বান এসেছিল সকল কাজকর্ম ছেড়ে নির্জন বাসে খাওয়ার এবং নিজের অন্তরের সন্ধান করার যাতে ভগবানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হতে পারি। আমি ছিলাম দুর্বল, সে আহ্বানে সাড়া দিতে পারিনি। আমার কাজ ছিল অতিশয় প্রিয়, আমার হৃদয়ের অহঙ্কারে মনে করেছিলাম আমি না থাকলে কাজের ক্ষতি হবে, এমনকি বিকল বা বন্ধ হয়ে যাবে। তাই ছাড়তে চাই নি। আমার মনে হল তিনি আমাকে পুনরায় বললেন — ' যে বন্ধন ছিন্ন করার শক্তি তোমার ছিল না, আমি তোমার হয়ে তা ছিন্ন করে দিয়েছি। কারণ এই কাজ কর সেটা আমি চাই নি। তোমার জন্য অন্য কাজ আমি ঠিক করে রেখেছি এবং তার জন্যই এখানে এনেছি, তুমি নিজে যা শিখতে পারনি তাই তোমাকে শিখিয়ে দিতে এবং তোমাকে আমার কাজের উপযোগী করে গড়ে তুলতে। তিনি আমার হাতে গীতা তুলে দিলেন, তাঁর শক্তি আমার মধ্যে প্রবেশ করল এবং গীতার সাধনা অনুসরণ করতে সক্ষম হলাম। বুদ্ধি ও অনুভূতি দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন রাগ, দ্বেষ থেকে মুক্তি হতে হবে, ফলাকাঙ্খা না রেখে তাঁর জন্য কর্ম করতে হবে, নিজের ইচ্ছা পরিত্যাগ করতে হবে, ভগবানের হাতে নির্দ্বিরোধ ও বিশ্বস্ত যন্ত্র হতে হবে, উচ্চ-নীচ, শত্রু-মিত্র, জয়-পরাজয় সবের প্রতি সমভাবাপন্ন হতে হবে, অথচ তাঁর কাজে শৈথিল্য করা চলবে না।

জেলের মধ্যে কোন কষ্টকেই আর কষ্ট বলে মনে হত না। জেলের রক্ষীদের হৃদয় অরবিন্দের অনুসারী হয়ে উঠল। ঈশ্বর যেন জেলের কর্তা ইংরেজ অফিসারদের বললেন — উনি বন্দী অবস্থায় কুঠুরির মধ্যে কষ্ট পাচ্ছেন, সকাল-সন্ধ্যা আধ ঘন্টা করে বেড়াতে দেওয়া হোক। সেইমত বেড়াবার ব্যবস্থা হল, এবং এই বেড়াবার সময় ঈশ্বরের ঐশী শক্তি পুনরায় তিনি পেলেন। 'যে জেল আমাকে মানব জগৎ থেকে আড়াল করে রেখেছে সেই দিকে তাকালাম, কিন্তু দেখলাম আমি আর জেলের উচ্চ দেওয়ালের মধ্যে বন্দী নেই, আমাকে ঘিরে রেখেছেন বাসুদেব। বৃক্ষের ছায়ার তলে বেড়াতে গিয়ে দেখলাম বৃক্ষ নয় স্বয়ং দাঁড়িয়ে শ্রীকৃষ্ণ, আমার ওপর তাঁর ছায়া ধরে রেখেছেন। আমার সেলের দরজার গরাদের দিকে চাইলাম, আবার বাসুদেবকে দেখতে পেলাম। নারায়ণ দাঁড়িয়ে থেকে আমার উপর পাহারা দিচ্ছিলেন। আমার পালঙ্কস্বরূপ যে মোটা কম্বল দেওয়া হয়েছিল তার ওপর শুয়ে আমি উপলব্ধি করলাম শ্রীকৃষ্ণ আমাকে বাহু দিয়ে জড়িয়ে রয়েছেন। সে বাহু আমার বন্ধুর, আমার প্রেমসম্পদের। তিনি আমার গভীরতম দৃষ্টি খুলে দিয়েছিলেন। চোর, খুনি, ডাকাত প্রমুখ জেলের রক্ষীদের দিকে তাকিয়ে তিনি বাসুদেবকেই দেখতে পেলেন। কোর্ট রুমে গিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটকে, সরকার পক্ষের উকিলকে দেখলোম শ্রীকৃষ্ণ রূপে। প্রিয় বন্ধুর মত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন — 'এখন আর ভয় আছে? আমি রয়েছি সকল মানুষের মধ্যেই, আমিই তাদের সকল কর্মকে নিজের ইচ্ছামত পরিচালিত করি। তোমার বিরুদ্ধে যে মোকদ্দমা আনা হয়েছে, এটা আমার হাতে ছেড়ে দাও।' এরপর শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ এলেন একেবারে অপ্রত্যাশিত ভাবে। তিনি তার অন্য সকল ভাবনা সরিয়ে, অন্য সমস্ত প্র্যাকটিস পরিত্যাগ করে, মাসের পর মাস বিনিদ্র রজনী কাটিয়ে, নিজের স্বাস্থ্য ভঙ্গ করে অরবিন্দের হয়ে মামলা লড়লেন। অরবিন্দ চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয়কে কিছু নথি, নির্দেশ লিখে দিতে উদ্যত হলে শুনলেন — 'তোমার পায়ে যে জাল জড়ানো হয়েছে তা থেকে এই মানুষটিই তোমাকে উদ্ধার করবে। ঐ সব কাগজ ফেলে দাও। তুমি তাকে উপদেশ দিতে যেওনা। উপদেশ দেব আমি। ..... আমি পরিচালন করছি, সুতরাং তুমি ভয় পেও না। তোমাকে যে কাজের জন্য জেলে এনেছি, সেই দিকে তুমি মনোযোগ দাও, আর যখন তুমি জেল থেকে বেরিয়ে আসবে, তখনও ভয়, দ্বিধা করোনা। .... জাতির মধ্যে, জাতির উত্থানের মধ্যে আমি রয়েছি, আমি বাসুদেব, আমি নারায়ণ, আমি যা ইচ্ছা করি তাই হবে, অপরে যা ইচ্ছা করে তা নয়। আমি যা ঘটাতে চাই, কোনো মানবীয় শক্তিই আটকাতে পারবে না।' অরবিন্দের কারাজীবনের সমাপ্তি ঈশ্বরের ইচ্ছাই হল বলে মনে করলেন।

এই ভাবে একদা নাস্তিক, ঈশ্বরে অবিশ্বাসী বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষের যোগসাধনার ফলশ্রুতিতে জেলের মধ্যে রূপান্তর ঘটল ঋষি অরবিন্দ হিসেবে। যিনি মনে করছেন জেলের বাইরে তাঁর ঈশ্বর নির্দিষ্ট কাজ হল ভারতীয় জাতিটিকে উন্নত করার। এবং সমগ্র জগতে সনাতন হিন্দু ধর্মের সত্যতা প্রতিষ্ঠা করা। এই কাজ করতে গিয়ে সমাজে চোর-ডাকাত, শিক্ষিত-মূর্খ, ধনী-দরিদ্র, স্বদেশী-বিদেশী সকলের প্রতি তিনি সাম্যবাদী দৃষ্টিতে তাকালেন। ব্রিটিশ পুলিশ বা প্রশাসন তাঁর চোখে অত্যাচারী হিসেবে ধরা পড়ল না। তাঁদের অন্তরে তিনি দেখতে পেলেন প্রাণের ঠাকুর বাসুদেবকে। বিপ্লবী জীবন ছেড়ে বেছে নিলেন ধর্মীয় জীবন। যে অরবিন্দ রাজা সুবোধ মল্লিকের সঙ্গে সভা করে মত দিয়েছিলেন বাংলায় চরমপন্থী আন্দোলনে অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজনে ডাকাতি করা যেতে পারে, তিনি জেল থেকে ছাড়া পেয়ে ভারতের সনাতন ধর্মের বাণী প্রচারের মাধ্যমে অরাজনৈতিক ভাবে জাতির গঠন ও উন্নতির জন্য নিজেকে নিয়োজিত করলেন। এরপর আজীবন জগতের উন্নতির জন্য, মানব মুক্তির জন্য আধ্যাত্মিক পথকেই শ্রীঅরবিন্দ বেছে নিলেন অন্তরাত্মার নির্দেশে। পরিত্যাজ্য হল তাঁর রাজনৈতিক পথ। লক্ষ লক্ষ নরনারী আজও শ্রীঅরবিন্দের আধ্যাত্মিক সাধনার সঙ্গে নিজেদের একাত্ম করে চলেছেন জীবনে শান্তি ও আনন্দের খোঁজে।

(বিঃদ্রঃ 'কারাকাহিনী' গ্রন্থের শ্রীঅরবিন্দের উক্তিগুলিতে আধুনিক বানানবিধি ব্যবহার করা হয়েছে এই প্রবন্ধে)

আত্মবন্দী

সজল কুমার ঘোষ

ঠাকুর বলতেন, 'মনেতেই বদ্ধ মনেতেই মুক্ত। মন হল ধোপা বাড়ির ধোয়া কাপড় গা, যে রঙে ছোপাবে সেই রঙে ধরবে, কিন্তু সেই মন-পাখি কি হয় গা। উড়ে বেড়ায় ঘুরে বেড়ায় । নজর থাকে ভাগাড়ের দিকে।'

কি অপূর্ব উক্তি! ঠাকুরের এই অমৃতময় কথা আমাদের সকলকে এক অদ্ভুত ভাবজগতে পৌঁছে দেয়। মন ভরে ওঠে আনন্দে। কিন্তু উক্ত কথার মাধ্যমে ঠাকুর কি বোঝাতে চাইলেন? — বোঝাতে চাইলেন স্থূল জগতে বন্দী বলে কিছু থাকলেও সূক্ষ্ম জগতে সেটি শক্তিহীন। কারণ নিজের মনই সত্তা নিজেকে বন্দী করে। আবার চাইলে নিজে মুক্তও হতে পারে। কিন্তু এই বন্দী দশা থেকে মুক্ত হওয়া এক কঠিন সাধনা। সেই সাধনার সিঁড়ি বেয়ে এগিয়ে যাওয়ার কথা আমরা হয়ত কোনদিন ভাবতেই পারিনা - চেষ্টা তো দূরের কথা! আমরা অগ্নিতে মৃত্যু জেনেও পতঙ্গের মত অগ্নিপানেই দৌড়তে থাকি আর ভাবি এই বুঝি এগিয়ে যাওয়ার পথ, আমরা বুঝিনা এ পথে আছে মৃত্যু নামক বন্দীত্বর চরম পরিণতি। তাই মুক্তির স্বাদ পেতে আমাদের চলার পথটিকে একটু বেঁকিয়ে নিতেই হবে, যেখানে পাব সমুদ্র - ক্ষীর সমুদ্র - ঝাঁপিয়ে পড়লেও মৃত্যু নেই। আছে বরং অমরত্ব।

আমরা শুনেছি মানুষ ঘরে বন্দী হয়, কারাগারে বন্দী হয়, খাঁচায় বন্দী হয়, বন্দী হয় একে অপরের হাতে বা কারসাজিতে কিন্তু বন্দী কি সত্যিই কেউ আমাদের করতে পারে - পারেনা যদি আমরা নিজেরা বন্দী না হই। তাহলে দেখি বিপ্লবী অরবিন্দ কারাগারে বন্দী হয়েও গীতার গুঢ় রহস্যের সন্ধানে জীবন সমর্পণ করে খুঁজে পান চিরন্তন মুক্তি - তবে ঋষি অরবিন্দ।

কংসের নিষ্ঠুর কারাগারে বন্দী হয়েও বসুদেব দেবকীর গর্ভে জন্ম নেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তারপর রচিত হয় এক অমর ইতিহাস।

আবার অন্যদিকে পাহাড় প্রমাণ ধনদৌলতের উচ্চশিখরে বসেও রাতের অন্ধকারে বেদনার বোঝা মাথায় নিয়ে ঘুমের বড়ি খেয়েও ঘুমোতে পারেনা অসংখ্য সাধারণ মানুষ। কিন্তু পাশের বাড়ির কুলি-মজুর দু'হাতের জোরে মাথায় বোঝা নিয়ে সারাদিন রক্তঝরা পরিশ্রম করার পরেও ঘুমের বড়ি না খেয়েও পরিবার পরিজন নিয়ে শান্তিতে ঘুম থেকে উঠে প্রাত্যহিক জীবন শুরু করে।

আসলে কায়িক শ্রম যখন মানসিক দ্বন্দ্ব মুছিয়ে শিক্ষাদীক্ষা, মেধা, দক্ষতা থাক বা না থাক আধ্যাত্মিকতায় প্রবিষ্ট হয় তখনই তো বন্দীত্ব চিরতরে মুছে যায়।

নতুবা কামারপুকুরে বালক গদাধর স্কুলের

চালকলা বাঁধা বিদ্যা অর্জন না করেও বিশ্বকে নতুন মুক্তি সূর্যের সন্ধান দিল কি করে! বা জয়রামবাটীর রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মেয়ে সরল সাদাদিধে এক গ্রাম্য বালিকা ধীরে ধীরে কিভাবে সকল দুঃখ কষ্ট অভাব অনটনের বন্দীদশা থেকে নিজেকে মুক্ত করে বিশ্বের দরবারে বিশ্বজননী রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

আসল কথা হল সামাজিক, অর্থনৈতিক, পারিবারিক গন্ডীতে যেভাবেই আমরা বন্দী হয়ে পড়েছি বলে ভাবিনা কেন, সততা আর পারস্পরিক ভালবাসা যদি ভেকবাজিতে পরিণত না হয়ে সত্যিকারের খাঁটি হয় কিছুতেই আমরা বন্দীত্ব থেকে মুক্তির স্বাদ গ্রহন করতে পারব না। অথচ মুক্তি, স্বাধীনতা আমাদের সকলকেই একদিন পেতেই হবে, নতুবা সব বৃথা। সেটি যত তাড়াতাড়ি হয় ততই মঙ্গল। আর যত দেরী হবে তার পরিণতি হবে ভয়ঙ্কর থেকে অতি ভয়ঙ্কর।

এ যেন ১-এর পিঠে অসংখ্য শূণ্য বসিয়ে মান বাড়িয়ে যাওয়া। অথচ ১-কে মুছে দিলে সবই ফাঁকা, মূল্যহীন। ঠিক তেমনি, খাঁটি মনটিই হল সেই ১ আর পার্থিব জগতের বাকী সব সুখ-সম্পদ শূণ্যের মত মূল্যহীন হয়ে পড়া বন্দীত্বের এক একটি শৃঙ্খল। এই শৃঙ্খল মোচনই আমাদের প্রকৃত বন্দীদশা থেকে উদ্ধার করতে পারে। নইলে চিটেগুড়ে পড়ে পিঁপড়ের মত কৃত্রিম মিষ্টি স্বাদের আশায় মৃত্যু অনিবার্য।

তাই বোধ হয় ঠাকুরের সর্বশ্রেষ্ঠ শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ বলতে পেরেছিলেন, স্বাধীনতা তোমাদের ইচ্ছে করলেই একদিনে দিতে পারি কিন্তু তোমাদের মধ্যে মানুষ কোথায়, যে স্বাধীনতা রক্ষা করবে। আগে মানুষ তৈরী কর, স্বাধীনতা তোমাদের আপনিই আসবে।

এ কথা জানার পর মনে প্রশ্ন জাগে আমরা কি মানুষ হইনি, তবে স্বাধীনতা পেলাম কিভাবে।

হ্যাঁ, স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি বৃটিশদের তাড়িয়ে পরাধীনতার বন্দীদশা আমাদের কেটেছে — কেটেছে অসংখ্য মানুষের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আর আত্মনিবেদনের ফলে। এখন আমাদের প্রতিজ্ঞা আছে আদর্শ পথ নেই, আবেদন নিবেদন আছে, আত্মবলিদান নেই।

তাই আমাদের মান ও হুঁশ নিয়ে সর্বতোভাবে নিজেদের উন্নীত করতে হবে, এখন আমাদের মান-ও যেতে বসেছে হুঁশ ও হারিয়ে ফেলেছি। অতএব আমরা প্রকৃত স্বাধীন হওয়ার পরিবর্তে মিথ্যা স্বাধীনতার বালুচরে হেঁটে বেড়াচ্ছি আর ভাবছি আমরা মুক্ত হব, বন্দীত্ব আমাদের কাছে তুচ্ছ। আমরা ভাবিনা পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া লোভ লালসা আর স্বার্থপরতার বিশাল বিশাল ঢেউ আমাদের ঐ বালুচরে একদিন আছড়ে পড়ে সবকিছুকে ভাসিয়ে দিয়ে পরাধীনতার গভীর গর্ভে পুনরায় ডুবিয়ে মারবে। সেদিন আকুলি বিকুলি করে ছটফট করতে করতে মৃত্যুর বেড়াজালে ফের বন্দী হয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না।

তাহলে পথ কি নেই। হ্যাঁ আছে, কি সে পথ ? আমাদের জাতীয় আদর্শ ত্যাগ ও সেবার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে নতুন করে জেগে ওঠা। বৈষয়িক উন্নতির সাথে সাথে আত্মিক উন্নতির লক্ষ্যে সর্বতোভাবে সচেষ্ট হওয়া। মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হওয়া — ব্যক্তি কল্যাণ নয়, সমষ্টি কল্যাণ চাই, ক্ষমতা নয় বন্ধুত্ব চাই, অভিশাপ নয় আর্শীবাদ চাই, যুদ্ধ নয় শান্তি চাই, মৃত্যু নয় অমরত্ব চাই, সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে। চাই, শুধু চাই, চাই নয়, নিজেদের বিলিয়ে দিয়ে ফকির হতে চাই।

জগৎ বন্ধন মাঝে

সুস্বাগত বন্দ্যোপাধ্যায়

যথা নদ্য স্যন্দমানঃ সমুদ্রে
অস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়ঃ
তথা বিদ্যান্ নামরূপাৎ বিমুক্ত
পরাৎপরং পুরুষমুযৈতি দিব্যাম্
— মুন্ডক উপনিষদ

নদীর জলধারা সাগরে মিশে যায়। এই বিশ্বের তিনভাগ জলের খাল-বিল-নদ-নদী নালার স্বপরিচিতি মুছে যায়। নাম পরিচিতি মুছে গেলেও নদীর কি মুক্তি হয়! জোয়ারের জল নদীর বুকে ফিরে আসে। মায়ার বন্ধন থেকে মুক্তি লাভে আত্মজ্যোতভবঃ অথবা সচ্চিদানন্দ উপলব্ধি শরীরের নয়, আত্ম চৈতন্যের। ত্রিধাতু - বায়ু-পিত্ত-কফের শরীরের বিনাশে মুক্তি। কিন্তু এই বন্ধন ছিঁড়ে কে বেরোতে পারে? স্থুল - অস্থুল - প্রাণ - অপ্রাণ অস্তিত্ব তো বন্দী দ্বন্দ্বের কারাগারে অপ্রাণে যদি আমরা এক তাহলে মাটির পৃথিবী থেকে শূণ্য পানে চেয়ে থাকি! পৃথিবীর ভালো মন্দ রূপ রস গন্ধ স্পর্শের পার্থক্যের দ্বন্দতো স্তব্ধ হয়ে যায়? এই মুক্তির আলো কে দেখতে পারে! মহাকালের ঘোর কুজ্বঝটিকায় আমরা বন্দী। প্রতিটি চেতনশীল অস্তিত্ব যদি ঈশ্বরের প্রকাশ, তিনিও তো বন্দী। বন্দী না থাকলে কি কালীর পুজো করতাম! কালো মেয়ের সৌন্দর্যের গহ্বারে অনন্ত আলোকরাশির ছটা। স্নেহের বন্ধন না থাকলে কে খুঁজতে যেত 'কৃষ্ণকলিকে'।

সন্ধ্যার আকাশে বেলুড় মঠের গঙ্গার ধারে স্বামী বিবেকানন্দর আরত্রিক সঙ্গীত খন্ডন ভব বন্দন, জগবন্দন বন্দী তোমায়। নিরঞ্জন নররূপধর, নির্গুণ গুণময়। নিরঞ্জন, নিরাকার নিরীশ্বর গদাধর চট্টোপাধ্যায়ের শরীরে বন্দী হয়েছিল বলে তাঁর মূর্তি গড়ে উপাসনা করি। জগবন্দিত শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। ভক্তের কৌলিন্য। মঠ মিশনে যুক্ত থাকলে আমাদের স্ট্যাটাস বাড়ে। ক্ষুধার বন্দী বাড়িতে এলে কাড়তে এলে ভাগ শ্যালা। মৃন্ময়মূর্তিতে ভক্তিরত আবেগের বন্ধন। প্রেমে বন্দী নয়।

চাটুজ্যে মহাশয় বলেছেন, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ সত্য। আমিও সত্য রসিক মেথর সত্য। এই সত্যও বোঝা দায়। আমরা তো কেউ স্থির নয়, অস্থির। ছোট শিশু থেকে বৃদ্ধ সবাই অস্থির। সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তন - উত্তরন - উলম্ফন। নেতির নেতিকরণ। 'পৃথিবীর গাড়িটা থামাও'; কে গাড়ি থামাবে? গতির চক্রজালে বন্দী আমরা। বাসে উঠলে ধাক্কা লাগাতে পারে। বলতে হবে সরি। ন্যায় অন্যায় বোধে বন্দী আমরা। গাড়ি কার কে খবর রাখে?

ব্রহ্মাণ্ড থেকেই আমাদের সৃষ্টি। আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসে সন্ধ্যার আকাশে পুরাকালে যে শুকতারা বা শুক্র গ্রহকে দেখি সেই গ্রহপথে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে কয়েকশো কোটি বছরের ব্রহ্মাণ্ডে মহাপ্রলয়ের ধ্বংসাবশেষ থেকে 'আমি' রক্ত-হাড়-মাংসের সংবৃত্তকরণে সৃষ্টি হয়েছি। ব্রহ্মাণ্ডও সৃষ্টি-স্থিতি-ধ্বংসে বন্দী, 'আমি' সৃষ্টির স্থিতি, ধ্বংসে বন্দী। 'আমি' মার্কণ্ডেয় পুরাণে চণ্ডীর মহাসরস্বতী, মহালক্ষ্মী, মহাকালী। যার রণচণ্ডী নৃত্য পাগলা গারদ থেকে কয়েক লক্ষ পাগলকে ছেড়ে দিলে তাদের উদ্দাম উত্তালতায় কল্পনা করলে বোঝা যাবে।

'মুক্তি ওরে মুক্তি কোথায় পাবি'। আত্ম অহমিকা ও চাহিদার নিবৃত্তি থেকে মুক্ত হওয়া যায়! এক প্রবীণ সন্ন্যাসীকে প্রশ্ন করেছিলাম, আপনি সাধু সন্ত, মুক্ত পুরুষ। সন্ন্যাসীর উত্তর - কে বলেছে 'আমি মুক্ত'? অস্থি-চর্ম নিজের অস্তিত্ব যতক্ষণ আছে কে মুক্ত। যার আমিত্ব বন্দী করেছে 'আকর্ষণে'। এই আকর্ষণ মুক্ত দীপায়নের আলো দেখার সাহস শক্তি বুদ্ধি নির্মম যন্ত্রণার আনন্দ উপভোগ সম্ভব? বিরজা হোম করে ধর্মায় স্বাহা, অধর্মায় স্বাহা বলে হোমাগ্নিতে সবকিছু অন্তস্থ আত্ম আকাঙ্খা পুড়িয়ে ফেলে গেরুয়া বসনে ত্যাগের আনন্দ উপভোগ করার শপথ নেয়। কিন্তু লোভ লালসার বিষ এত সহজে পোড়ে না ক্ষমতার আত্ম পরিচয় সাধুকে বন্দী করে অহমিকার অন্তর্জালে। সুতরাং যতই উচ্চারিত হোক "ঈশা ব্যাস্যমিদং যত্বা .....।" দৃশ্যমান পরিবর্তনশীল জগতের সব কিছুই ঈশ্বরের দ্বারা

পবিত্র ত্যাগের দ্বারা স্থিতিলাভ করা যায়। অপরের ধন সম্পত্তি প্রভাব এর প্রতি লোভের দ্বারা নয়। বিরল তম সন্ন্যাসী পারে বিরজাহোমের আগুনে নিজের অহমিকা পোড়াতে সেইই সাধু মুক্ত স্বত্ত্বা যার গেরুয়া বসনের আগুনের সুবাসে বিশ্বসংসার অনুরণন করবে।

ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজমান। এই ভাবনায় যদি আমরা বন্দী হই তবে তো ধনী দরিদ্রের আলাদা অবস্থান হয় না। দেশ-কাল- ধর্ম বর্ণর বিভেদের কারাগারে বন্দী হইনা। মানব-ঈশ্বর বিশ্ব গড়ে ওঠে। মল মূত্র ত্যাগের বন্ধন ছাড়া সব বন্ধন মুক্ত মানব নয় আমরা মহামানব। রাষ্ট্রের আইন দ্বারা চোর, ডাকাত, ধর্ষক আর শাসকের বিরোধীতার কারণে 'আনলফুল প্রিভেনশন এ্যাক্ট' দ্বারা রাজবন্দীদের রাম ধোলাই খেতে হয় না। রাম নাম সত্য হ্যায়! রাম মন্ত্র, রাম যন্ত্র ব্যবহার করলেই বন্ধন মুক্তি!

বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য, রামানুজ, শ্রীরামকৃষ্ণ —বিবেকানন্দের চিন্তাধারা শরীর থেকে মুক্ত কিন্তু জগৎশালায় বন্দী। ভজনা অথবা 'ব্যান্ড ইমেজেস'-এর তাড়ণা। কর্পোরেট সম না থাকলে বোঝা যাবে কী করে ঈশ্বরের লীলা। সন্ন্যাসী সাধুকে দেখলে তার কাছে যেতে ইচ্ছা করে। জ্ঞানের অথবা সাটাঙ্গ প্রণাম করলে যদি তার চরণে চোখ বন্ধ করে আলো দেখি অথবা তার আশীর্বাদ উপরি পয়সা আনে। সাধু সন্তরাই তো ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডার। এক সন্ন্যাসীর সাথে কিছু দিনের জন্য সখ্যতা হয়েছিল। আলটপকা প্রশ্ন করে ফেলেছিলাম এক প্রবীণ সন্ন্যাসীকে দেখেছিলাম চশমাটার সুতো দিয়ে বাঁধা আর পায়ের জুতো সেপটিপিন লাগানো আর কিছু সাধুর মখমলের পোষাক, এসি গাড়ি ছাড়া চলেন না। উত্তরে বলেছিলেন আপনারা তো রেশন কার্ড বানাচ্ছেন, আমরা নয়। আমরা ত্যাগী সন্ন্যাসী। জন্মনিয়ন্ত্রণের বড়ি খেয়ে নারী যদি বন্ধ্যা হয়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ দ্বারা ত্যাগ করে আর সন্ন্যাসীর কাঞ্চন ছাড়া কামিনী ত্যাগ যদি এক হয় তাহলে তো সন্ন্যাসীর মুক্তি বলয়-এ আনন্দধারা।

অভাগী মন তো জীবনের চরম বন্ধু। বন্ধুর বন্ধুত্বের বন্ধন শিশু তাঁর কান্নার মধ্য দিয়ে বক্ষ দুগ্ধের জন্য মায়ের কাছে যায়। আর বয়সের সাথে ভোগবিলাসের আকর্ষণী বন্ধন। ব্যাক্তি জাতি রাষ্ট্রহীন সাম্যবাদ প্রলেতারিয় আন্তর্জাতিকতাবাদ অথবা ভোগহীন, আলোকায়নের বিশ্ববাসীর অলীক স্বপ্ন দর্শন। ভোগবাদের আকাঙ্খা বন্দী করে আমাকে অন্ধকারের মন্দিরে।

"আমি নিশাচর অন্ধকার মোর সিংহাসন
আমি হিংস্র দুরন্ত পাশব
সুন্দর ফিরিয়া যায় অপমানে, অসহ্য লজ্জার
মোর রূদ্ধদ্বার অন্ধকারে মন্দির প্রাঙ্গণে।" *(বন্দীর বন্দনা)*

অন্ধকার মন্দিরে বন্দী শত হতাশার অন্ধকারের মাঝেও আশার আলো দেখি প্রেমের অভিসারে।

"তুমি মোরে দিয়েছো কামনা অন্ধকার অমারাত্রি সম
তাহে আমি পড়িয়াছি প্রেমে, মিলিয়াছে স্বপ্ন সুধা সম।
তুমি যারে সাজিয়াছো ওগো শিল্পী, সে তো নহি আমি
সে তোমার দুঃস্বপ্ন দারুণ।
বিশ্বের মাধুর্যরস তিলে তিলে করিয়া চয়ন
আমারে রচেছি আমি
তোমার ত্রুটিরে আমি আপন সাধন দিয়ে করেছি।"

বুদ্ধদের বসু (বন্দীর বন্দনা)

পৃথিবীতে জেল বন্দী মানুষের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে। সেখানে প্রতি ১,০০,০০০ মানুষে ৭২৪ জন জেল বন্দী। জেল বন্দী মানুষের সংখ্যায় দ্বিতীয় স্থানে আছে রাশিয়া। সেখানে এই সংখ্যাটা প্রতি লক্ষে ৫৪১ জন। সমগ্র পৃথিবীর জনসংখ্যার হিসাবে মোট বন্দী মানুষের সংখ্যা প্রতি লক্ষে ১৪৪ জন। সমগ্র বিশ্বের বন্দীর তুলনায় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে জেল বন্দী মানুষের সংখ্যা ৫গুণ বেশী।

বন্দী পুরাণ

পল্টু ভট্টাচার্য

আমাদের ক্লাস ফোরের বন্ধু ছিল দুলাল নন্দী। তাকে আমরা স্কুলে খ্যাপাতাম একটা ছড়া বলে 'দুলাল নন্দী / আঁটে খালি ফন্দি / কারাগারে বন্দী'। ও কাঁদতে কাঁদতে বলতো আমার মা বলেছে মানুষ যতো বড়ো হবে ততো বন্দী হবে। তাই তোরাও দেখিস বন্দী হবি। আজ জীবনের পশ্চিমে পৌঁছে বুঝি দুলালের সেই উক্তি একশো ভাগ খাঁটি। আমরা বন্দী মানে স্বাধীনতা সংগ্রামে, চুরি, খুন, ডাকাতি করে হাজতবাস করা বুঝি না যুগের হাওয়ায় উলটা বুঝলি রাম। আমরা প্রতিটা মানুষ প্রতি পদে পদে বন্দী। কোথাও আমাদের বন্দী হীন স্বাধীন জীবনযাপন নেই। হালফিলে করোনা আর কোভিড আমজনতাকে গৃহবন্দী করেছে। বাপের জন্মে শুনিনি মাসের পর মাস ঘরে বসে থাকলে রোগ ধরবে না। তাহলে কি কবি নন্দলাল বাস্তবে সত্যি? এই তো আজকের যুগে সবাই শপিং মলে বাজার করে। সুবিধে এক জায়গায় সব জিনিষ পাওয়া যাবে। সেই দু'পেয়ে খদ্দেরকে একটা ঝাঁ চক চকে অলিখিত পাঁচতলা বাড়িতে বন্দী করে রাখে। কিনতে গেলে সব্জি যখন বেরোলো তখন উটকো জিনিস সঙ্গে। দিব্যেন্দুবাবু রিটায়ার করে সস্ত্রীক আমেরিকা, ইউরোপ ঘুরতে গেলেন। বিশলাখ টাকা খরচা করে এক বিচিত্র বন্দী জীবন, খালি প্লেন, গাড়ি, হোটেল বদলাতে বদলাতে একমাস কাবার, ম্যানেজার প্লেনে তুলে বলে হোটেলে ঢুকতে হবে। হোটেলে ঢুকে কোথায় গেলো পঞ্চব্যঞ্জন। ভোরে চান করে নগর দর্শন। তারপর লাঞ্চ মানে বিয়েবাড়ির মতো লম্বা বেঞ্চে বসে নাকে মুখে গুঁজে আবার নগর দর্শন' মন চায় বাড়ি ফিরতে কিন্তু ট্যুর ম্যানেজারের কাছে বন্দী, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সকাল থেকে মাঝ রাত পর্যন্ত আমরা সবাই বন্দী, কি যুগ পড়লো। শবদেহ সেও বন্দী। কাঁচের এসি গাড়ি, কি সব নাম 'স্বপ্নের দেশে', 'নাম না জানার দেশে', 'পুষ্পক রথ', 'ইন্দ্রলোক', 'সারথি', 'চিত্রগুপ্তের সন্ধানে', 'মায়া লোক', আর গাড়ির মধ্যে ষ্টিরিওতে বাজছে 'বল মা তারা দাঁড়াই কোথা' কিংবা 'মাগো আনন্দময়ী .....' তাই বন্দীদশা কাটে না বরং আরো চেপে ধরে। বকুলদা বিকেলে পার্কে বুড়োদের সঙ্গে আড্ডা দেবে উপায় নেই বৌদির যোগের ক্লাস, নয়তো ভজনের ক্লাস, বাড়ি আগলাও। জন্ম, শিক্ষা, চাকরি, অবসর জীবন, এমন কি আহার, নিদ্রা, মৈথুনও বন্দী। কারণ গোটা জীবনটা বন্দীত্ব করতে করতে আনন্দটা শুকিয়ে যায়। বন্ধু যতীনের বাবাকে নিয়ে বাঁশতলা ঘাটে গেছি পুড়বেন সেই চেম্বারে বন্দী হয়ে। হঠাৎ উঠে বললেন কি ব্যাপার? আমাকে এখানে এনেছ কেন? আমার কি এম আই আর হবে? হতভম্ব যতীনকে ভরসা দিয়ে বলি ট্রেড ইউনিয়ন নেতা তো অতো মালার চাপে ওনার হার্টটা চালু হয়ে গিয়েছে। না যতীনের বাবা আবার চিরনিদ্রায় গেলেন এবং বন্দী চেম্বারের দিকে এগোলেন। 'বন্দী জীবনটাই আর কিছু নয়, এক মুঠো ধুলো / চৈতী বাতাসে ওড়া শিমূলের তুলো।'

বন্দীদশা

পারমিতা সরকার

'জীবন বহিয়া যায় নদীর স্রোতের ন্যায়' — খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এই কথাটি। তাই জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে প্রতিটি মুহূর্তে আমরা উপলব্ধি করি সময়ের মূল্যবোধ। এই বিশ্বসংসারে প্রতিটি জীব প্রতিনিয়ত তাদের কর্মক্ষমতা সঞ্চালন করে সময়ের ঘেরাটোপে।

তবু কখনো কখনো নানা কারণে নানা পাকদন্ডীতে জীবন থমকে যায় সময়ের মায়াজালে। সময় কিন্তু বয়ে চলে তার নিজস্ব ছন্দে; দাঁড়ি পড়ে মানুষের কর্মকান্ডে। এক লহমায় থেমে যায় জীবনের গতি; শুরু হয় এক বন্দীদশা।

ঘটনা-১ ঃ

আট বছরের ছোট্ট মেয়ে তিন্নি। সারাদিন দাপিয়ে বেড়ায় তার ছোট্ট ছোট্ট পায়ে সারাবাড়ি, এক সন্ধ্যেবেলা মায়ের হাত ধরে নাচের স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে রাস্তায় গর্তে পা পড়ে যায়। সিমেন্টের পাটাতনের মাঝে পা পড়ে যায় তিন্নির। অনেক চেষ্টা করে স্থানীয় মানুষদের সাহায্যে যখন সেই পাটাতন সরিয়ে পা বের করা হয় দেখা যায় পাটাতনের লোহার রড গেঁথে গিয়েছে তার হাঁটুর উপরের অংশে। জরুরী অবস্থায় নানান হাসপাতাল ঘুরে সেই ক্ষত সারানোর চেষ্টা শুরু হয়। ভুল চিকিৎসায় সেই ক্ষত বিষাক্ত হয়ে যায়। ফলে ডাক্তারী নির্দেশে বন্ধ হয় তার হাঁটাচলা। স্কুল, নাচের স্কুল, ঘোরা-বেরানো সব বন্ধ। শুরু হয়তার বন্দীদশা। ছটফটে প্রাণোচ্ছল তিন্নিকে সুস্থতার খাতিরে বাধ্য করতে হয় সারাদিন একজায়গায় বসে থাকতে। চোখের জল চেপে রেখে তিন্নিকে সারাদিন মন ভুলিয়ে রাখতে তার বাবা-মা, প্রিয়জনেরা অবিরাম চেষ্টা করত। তার মধ্যেই চলত তার চিকিৎসা। দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসা চলাকালীন তার দুই হাতে স্যালাইনের সূঁচ বেঁধানো অবস্থায় নিজের বন্দীদশাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সে ছবি আঁকত, গান গাইত। প্রায় একবছর যাবত তার এই বন্দীদশা তার মনোবলকে ভাঙতে পারেনি। ক্রমে তিন্নি সুস্থ হয়ে ফিরে গেছে তার নিজস্ব জগতে।

ঘটনা ঃ ২

কখনো কখনো মানুষ স্বেচ্ছায় বন্দীদশা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। কোন কিছু ভালোর আশায় কাঙ্খিত বন্দীদশায় সে হয়ে ওঠে অভ্যস্ত। কর্পোরেট দুনিয়ায় চাকরীরতা, আধুনিকমনস্কা, স্বনির্ভর মধুরিমা বিয়ের আটবছর পরেও যখন সন্তান ধারণে অক্ষম ছিল মনোবল হারিয়ে প্রতি মূহুর্তে মনে হত তার জীবন ক্রমশ অর্থহীন হয়ে পড়ছে। বন্ধুর মতো স্বামী, শ্বশুরবাড়ির সকলের ভালোবাসা পেয়েও তার জীবন হয়ে উঠেছিল বিস্বাদ। আশার আলো দেখিয়ে যখন ডাক্তার বাবু বললেন যে সে সন্তানধারণ করতে পারবে কিন্তু দশমাস বন্দী হয়ে থাকতে হবে তাকে ঘরে, কোথাও যাতায়াত তো দূরের কথা বাড়ির মধ্যেই উপর নীচ করাও বারণ। বুক ভরা আশা নিয়ে স্বেচ্ছায় মেনে নিয়েছিল ডাক্তারের সমস্ত নির্দেশ। মা হবার আনন্দে সে বিসর্জন দিয়েছিল তার সমস্ত বাহ্যিক আনন্দ, শখ, কর্মকে। তখন যে তার উদ্দেশ্য একটাই; মাতৃত্বের আস্বাদ। অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল ডাক্তারের সমস্ত কথা তার সাথে মা-শাশুড়িমার দেওয়া নিয়মকানুন। প্রতিটা ক্ষণ অনুভব করত নিজের জঠরে একটা ভ্রুণের ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠাকে। এ যে এক অনাবিল আনন্দ। ক্রমে আসে সেই বিশেষক্ষণ। যার জন্য তার আকুল প্রাণ। মা হয় মধুরিমা। জন্ম দেয় এক ফুটফুটে সন্তানের।

ঘটনা ঃ ৩

জুন মাসের শেষে বর্ষায় প্রকৃতির রূপ দেখতে স্ত্রী-কন্যা ও বাবা-মাকে সঙ্গে করে দিন দুইএর ছুটি নিয়ে দেশের বাড়ি ঘুরতে যায় অম্বরীশ। হাওড়া থেকে প্রায় ৪০ কি.মি. দূরে আমতার কাছে তাদের গ্রাম মাজু। এমনিতে বাড়িটা ফাঁকাই থাকে; একজন দাদা থাকেন বাড়ির দেখাশুনা করেন, পরিষ্কার করেন। গ্রাম হলে কি হবে! কাছাকাছি দোকানপাট, সুযোগসুবিধা সবই রয়েছে। রাস্তাও বাঁধানো তাই কোন অসুবিধাই হয় না। হাল্কা বৃষ্টিতে গাড়ি নিয়ে বেড়িয়ে সকাল

দশটার মধ্যে পৌঁছে যায়। উঠোনের সামনে এক বিশাল কনকচাঁপার গাছ। যার ফুলের সুবাসে চারিদিক ম ম করছে। বর্ষায় সবুজ আরো সবুজ হয়ে ওঠে। এখানে এলে সেই সবুজের সমারোহে সকলে যে প্রকৃতিতে হারিয়ে যায়। কিন্তু দুপুরের পর থেকে আকাশের মুখ ভার হয়ে যায়। শুরু হয় আকাশ কালো করে ঝোড়ো হাওয়া ও বৃষ্টির দাপট। বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে বিদ্যুৎ সংযোগ। সারা রাত ধরে চলা এই বজ্রবিদ্যুৎ সহ তীব্র বৃষ্টিপাতের ফলে কার্যত বন্ধ হয়ে পড়ে জনজীবন, বন্দী হয়ে পড়ে ওরা। পরের দিন সকালে পরিস্থিতি আরো জটিল হয়ে গেল। এই তান্ডবলীলায় গাছ পড়ে রাস্তাঘাট বন্ধ। হু হু করে জল বাড়ছে; উপচে পড়েছে পুকুর। পরিস্থিতি চলে যাচ্ছে হাতের বাইরে। ছোট বাচ্ছা, বয়স্ক বাবা-মাকে নিয়ে অম্বরীশ ভেবে পায় না কিভাবে সামাল দেবে এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতির। দোতলার বারান্দা থেকে নীচে দেখে উঠোনে রাখা গাড়িটাও প্রায় ডুবে আছে। দুদিন ধরে বাড়িতে আলো নেই; সমস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন। এই বাড়িতে না থাকার কারণে খাবার মজুত নেই তেমন, বাইরে বৃষ্টির বিরাম নেই। ঘরে নেই জল খাবার। এই দূর্বিষহ বিভীষিকার মধ্যে পড়ে বিনিদ্র রজনী কাটানো। সকালে ছোট বাচ্ছার খাবার সংস্থান পর্যন্ত নেই। অকুল পাথারে বুক কাঁপে তাদের। এ এক অসহনীয় বন্দীদশা। সকালে একচিলতে রোদ এসে পড়েছে তাদের পূবের বারান্দায়। বৃষ্টি থেমে গেছে। কিন্তু চারিদিকে শুধু জল আর জল। দূরের ছোট ছোট মাটির বাড়িগুলোর চালা দেখা যাচ্ছে। সেই মানুষজনই বা কোথায় কোনক্রমেই খাবার আনতে যাবার উপায়টুকু পর্যন্ত নেই। গলা বুজে আসে, চোখ তার ঝাপসা। হঠাৎ এক তীব্র আওয়াজে আকাশের দিকে তাকাতে চোখ যায় হেলিকপ্টার করে শুকনো খাবার আর জল ফেলছে বায়ুসেনর দল। রুদ্ধপথে আশার আলো পেয়ে পড়িমড়ি করে ছুটে যায় সকলে মিলে সংগ্রহ করে মুখের গ্রাস। কোনরকমে আরো দু'দিন চলল। ধীরে ধীরে জল নামতে শুরু করেছে। রেলপরিষেবা তখনও বন্ধ। বাড়ি ফেরার পথ এখনো অবরুদ্ধ। ত্রাণের খাবার খেয়ে, জল আলো হীন অন্ধকার পুরীতে কোনরকমে কাটাল তাদের বন্দীজীবন। এ এক ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা, ভয়ঙ্কর বন্দীদশা।

ঘটনা ঃ ৪

সান্দকফুর বেসক্যাম্প রিম্বিক। রিম্বিক যাবার পথে ধোত্রে পেরিয়ে রামম্যামের একটু আগের পাহাড়ি রাস্তা। প্রতিবছর বহু যাত্রীবাহী বাস এই রাস্তা পেরিয়ে তাদের গন্তব্য স্থলে পৌছায়। এই পথ বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। তা উপেক্ষা করে প্রতিবছর বহু পর্যটক এই পথ দিয়ে যায় বাসে করে, এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময় জনা কুড়ি যাত্রী নিয়ে কয়েকটি বাস এই পথ দিয়ে যাওয়ার সময় ধস নামে। বাস শিলিগুড়ি থেকে ছাড়ার সময় বৃষ্টি শুরু হয়। ঘুম স্টেশন পেরিয়ে যাবার পর আকাশ কালো করে আসে; আর শুরু হয় প্রচন্ড বৃষ্টি। ধোত্রে যাবার রাস্তা থেকে ছোট খাটো ধ্বস নামে। কিন্তু তারপরের রাস্তাতেই ক্রমাগত ধ্বসের সম্মুখীন হয় যাত্রীবাহী গোটা তিনেক গাড়ি। শিশু ও বয়স্ক মানুষজনেরাও ছিলেন এই গাড়িগুলিতে। ঝোড়ো হাওয়া আর প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে পাহাড়ি পিছল রাস্তায় খাদের ধারে দাঁড়িয়ে রীতিমতো দুলতে থাকে বাসগুলো। কিন্তু বাস থেকে নামার কোন রাস্তা নেই। কাঠের পুতুলের মতো বসে থাকা ছাড়া কোন উপায় নেই। প্রচন্ড খিদে আর হাড়কাঁপানী ঠান্ডায় বৃষ্টির জলের ঝাপটায় ভিজে যাওয়া জামাকাপড় পরে গাড়ির মধ্যে আড়ষ্ট হয়ে বসে ইষ্টনাম জপ করা ছাড়া কোন পথ নেই। তারই মধ্যে চোখের সামনে পাহাড়ের ঢালে গজিয়ে ওঠা একটা চায়ের দোকান নিমেষে ধ্বসের ফলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আর্তনাদে আতঙ্কে শিউরে ওঠে যাত্রীরা। কি পরিণতি, অপেক্ষা করছে তাদের জন্য? প্রতিটি মূহুর্ত যেন এক এক প্রহর! প্রায় সাড়ে চারঘন্টা এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকার পর সেনা জওয়ানদের দেখা পাওয়া যায়। ক্ষীণ আশায় বুক বাঁধে যাত্রীরা। জওয়ানদের তৎপরতায় যাত্রীদের কোনরকমে গাড়ি থেকে নামিয়ে কাছাকাছি একটি সেনা ছাউনিতে আশ্রয় দেওয়া হয়। নিজেদের জীবন বাজি রেখে সেনা জওয়ানরা কি নিখুঁত কর্মদক্ষতায় মানুষগুলোকে নিয়ে পৌঁছায় এক নিরাপদ আশ্রয়ে। গরম খাবার দিয়ে মানুষগুলোকে ধাতস্থ করে। এরপর পরিস্থিতি একটু স্বাভাবিক হতে খুব ধীর গতিতে গাড়ি চালিয়ে সেনারা রামম্যাম জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে নিয়ে পৌঁছে দেয়। তখন রাত তিনটে। ঘুম স্টেশন যখন পেরোয় সময় তখন দুপুর দুটো।

তারপরই এই পরিস্থিতি। টানা এগারো ঘন্টার বন্দীজীবন তাদের জীবনে বাঁচার মানে বদলে দেয়। ধোত্রেতে কাটানো আতঙ্কের প্রহর তাদের কাছে নতুন জীবনদান।

এইরকম কতো বিচিত্র ঘটনায় বন্দীজীবন কাটাতে হয় মানুষকে। এই বিশ্বসংসারে নানাভাবে নানা ভূমিকায় কাটাতে হয় মানুষের বন্দীদশা।

বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে গোটা বিশ্ব উপলব্ধী করছে এক অনির্বচনীয় বন্দীদশার। হাজার স্বপ্নের ভীড়ে জড়িয়ে থাকা এই জীবন হঠাৎ এক অদৃশ্য শত্রুর ফাঁদে পা দিয়ে দুঃস্বপ্নের কারাগারে বন্দী হয়ে পরেছে। আষ্টেপৃষ্টে চারিদিক থেকে বেঁধে ফেলেছে আমাদের। প্রতিনিয়ত মানুষ চেষ্টা করে চলেছে এই বন্ধন মুক্ত হয়ে আবার স্বমহিমায় ফেরার। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে সমগ্র মানবজাতি তথা দেশ তথা বিশ্ব থমকে গেছে ধীরে ধীরে।

কিন্তু আশাবাদী আমরা বিশ্বাস করি এই দুঃস্বপ্নের মায়াজাল ভেদ করে আশার আলো জ্বলবেই। মানুষ ফিরবেই নিজস্ব ছন্দে। পৃথিবী আবার নিঃশ্বাস নেবে প্রাণ ভরে।

পৃথিবীর সব দেশেই জেলের কয়েদীদের জন্য আলাদা পোষাক থাকে, যাতে সহজেই তাদের চিহ্নিত করা যায়। সিনেমার সুবাদে আমরা জেলের কয়েদীদের যে পোষাকে দেখতে অভ্যস্ত, সেই সাদার ওপর কালো লম্বা দাগ দেওয়া জামা আর খাটো প্যান্ট সত্যিই কয়েদীদের পরিয়ে রাখা হয় কিনা জানা নেই। কারণ, জেলের ভেতরের কয়েদীদের যে ছবি, সংবাদপত্রে বা পত্রিকার পাতায় দেখতে পেয়েছি সেখানে কাউকে এই পোষাকে পাই নি। বাইরের দেশ গুলোতে বন্দীদের আলাদা পোষাক আছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে পরে সাদা বা সাদার ওপর কালো লম্বা দাগ দেওয়া জামা আর প্যান্ট ছিল কয়েদীদের পোষাক। বর্তমানে বহু দেশে জেল বন্দীদের উজ্জ্বল রঙের রঙীন পোষাক পরানো হয়।

নাৎসি কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে ইহুদী বন্দীদের পোষাক

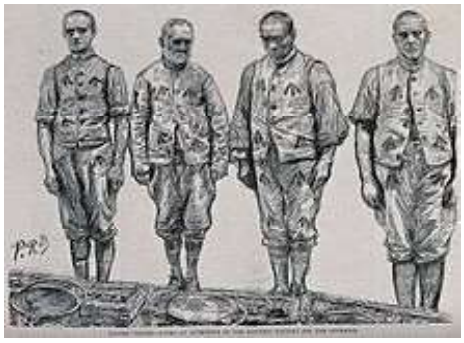

১৯ শতকে ইংল্যাণ্ডের বন্দীদের জন্য ব্যবহৃত পোষাক

১৯২০ সালের হলিউডি ছবিতে বন্দীদের পোষাক

১৯ শতকে আমেরিকার বন্দীদের জন্য ব্যবহৃত পোষাক

বন্দীজীবন — বাইরে ভিতরে

প্রদীপ ভট্টাচার্য

বন্দী জীবন। জেলার খবর সমীক্ষার ১৪২৭ বঙ্গাব্দের পূজা সংখ্যার আলোচ্য বিষয়। স্বাভাবিক! এই বঙ্গাব্দ শুরু হবার অনেক আগে থেকেই বস্তুতঃ এই দেশ তথা সারা বিশ্বেই শুরু হয়েছে এক অভূতপূর্ব বন্দী জীবন এক মারণ ভাইরাসকে কেন্দ্র করে। 'করোনা' নামক এই মৃত্যু বিভীষিকা দাঁড়ি টেনে দিয়েছে মানুষের স্বাভাবিক কর্ম জীবনে - এটা করো না ওটা করো না বলে। ভাইরাস ভয় আক্ষরিক অর্থে মানুষকে ঘর বন্দী করে রেখে ছিল তিন মাস। ভাইরাস পৃথিবী না ছাড়লেও জীবনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি মানুষকে আবার পথে নামাতে শুরু করেছে পুরোপুরি দাঁড়ি না টেনে কমা সেমিকোলনের মাধ্যমে। এই জগতের সকল প্রাণীই স্বাধীন জীবন পছন্দ করে। বন্দী দশা কেউই পছন্দ করে না। এই প্রকৃতির প্রাণীকূলের মধ্যে বন্দীত্ব বলে কোন ব্যাপারই নেই। মানুষও তার ব্যতিক্রম হবার কথা নয়। কিন্তু কি আশ্চর্য! অবিসংবাদিত ভাবে শ্রেষ্ঠতম জীব হওয়া সত্ত্বেও মানুষই কিন্তু এক মাত্র প্রাণী যারা বন্দীত্ব ব্যাপারটাকে আমদানি করেছে। ব্যক্তি মানুষ স্বেচ্ছাবন্দীত্বকে নানাভাবে বন্দনা করেছে তো বটেই, সমাজের নিরাপত্তার খাতিরে সে অন্য ব্যক্তিকেও বন্দী করে রেখে দেওয়ার রীতিও চালু করেছে। তার জন্য সে কারাগার নামক বন্দীঘর তৈরি করেছে, সামাজিক অপরাধ করা মানুষের জন্য। সে অপরাধ শুধু মাত্র তার নিজের প্রজাতির প্রতিই নয়, অন্য প্রজাতির প্রতি গুরুতর অপরাধ করা মানুষকেও দন্ডদানের বিধান আছে। সংরক্ষিত অরণ্যে গিয়ে পশুনিধন করা অপরাধ। অতএব এমন কাজকর্ম যদি কেউ করে, তবে তাকে কারারুদ্ধ করার বিধান মানুষের সমাজে আছে। সে বিধান সর্বত্র সমানভাবে কার্যকর হচ্ছে কিনা সে প্রশ্ন, সে তর্ক এখানে অনাবশ্যক। কিন্তু এ তো হল সামাজিক অপরাধে অপরাধী মানুষের বন্দীত্বের কথা! এ বন্দীদশা তো বাইরের। এ বন্দীকে তো চোখে দেখা যায়। কারাবাস শেষ হলে সে আবার বাইরের বাতাসে শ্বাস নেবার সুযোগ পায়। হাল আমলে যেমন কোয়ারান্টাইনে থাকা মানুষের একটা নির্দিষ্ট সময় অন্তে আবার সামাজিক মেলামেশার বাধা থাকছে না। এই বন্দীদশার বাইরেও কিন্তু আর একরকম বন্দীদশা আছে, যেটা অনেক মানুষের না জানাই থেকে যায় সারাজীবন। এই বন্দীত্ব অন্তরের। নিজের ভিতর নিজেদেরকে বন্দী করে তারা গুটিপোকার মতন যাপন করে যায় একটা গোটা জীবন।

এই বন্দীত্ব তাকে দেয় তার মন। মানুষের মন বড় বালাই। মানুষের যত আবেগ, কঠোর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে শরীরতত্ত্বের অনুশাসন না মেনে যদি ভাবি সবই মনের সৃষ্টি। বৈজ্ঞানিক বলেন, মানবশরীরে মনের তো কোন অস্তিত্ব নেই, সবই আসলে আমাদের মস্তিস্ক এবং বিভিন্ন হর্মোনের ক্রিয়াকলাপ। বিজ্ঞানের নিক্তিতে চুলচেরা হিসাব যদি না করি, সাধারণভাবে আমাদের বিভিন্ন আবেগের জন্য আমরা মনকেই দায়ী করি। আমাদের ইচ্ছা, আমাদের লোভ, আমাদের ভয়, আমাদের রাগ এবং অনুরাগ সবারই উৎপত্তিস্থান হল আমাদের মন। 'আমি পারবই' একথাও কিন্তু মনই বলে। আধ্যাত্মিক গুরু যেমন বলেছেন, 'মনেতেই বদ্ধ, মনেতেই মুক্ত'।

দুনিয়ার যত প্রাণী আছে সবাই চলে প্রবৃত্তির অনুশাসনে। তারা খিদে পেলে খায়, ঘুম পেলে ঘুমায়, তাদের প্রজনন প্রাকৃতিক ভাবে নিয়ন্ত্রিত। মানুষের ক্ষেত্রে কিন্তু মলমূত্র ত্যাগের মতো রেচনকর্ম ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রবৃত্তির তুলনায় মনের ভূমিকাই বহুক্ষেত্রে প্রধান হয়ে ওঠে। তাই লোভের বশবর্তী হয়ে বা অনুরোধ এড়াতে না পেরে আমরা ক্ষিদে না পেলেও খাই, আবার কখনও বা পেট খিদেয় অস্থির হলেও, কাজের অজুহাতে খালিপেটে থেকেও যাই ঘন্টার পর ঘন্টা। ঘুমের বেলায়ও তাই। কাজের দাবিতে বা নিছক অভ্যাসের বশবর্তী হয়ে সারারাত জেগে কাটিয়ে দিই। কখনও আবার শুধুমাত্র শুয়ে থাকতে 'ভাল' লাগছে বলে কাজ থাকলেও বিছানা ছাড়তেও চাই না। এসব ক্ষেত্রে

আমরা নিজেদেরকে 'বন্দী' করে রাখছি মনের ফাঁদে পড়েই। এই বন্দীত্ব যদি না চাই, তাহলে আমাদের বেছে নিতে হবে দুটির একটিকে - হয় মন, নয়তো জীবন। স্বাভাবিক ভাবেই, জীবনের দাবীই অগ্রাধিকার পাবার যোগ্য। আর যদি তা না হয়, যদি জীবনের থেকে মনকেই সব গুরুত্ব দিয়ে বসে থাকি, তবে আমাদের জীবনে নানা বিড়ম্বনাও নেমে আসে বইকি! সব থেকে বড় বিড়ম্বনা হল, কী যে আমরা ঠিক চাই সেটাই বুঝে উঠতে না পেরে সারাজীবন সাঁতার না জানা লোকের মতো ডুব জলে নেমে হাঁসফাঁস করি।

নিজের জীবনেকে 'সফল' করে তোলার জন্য মানুষ সাধনা করে। কঠোর নিয়মানুবর্তীতায় নিজেকে বেঁধে 'সফলতার' ব্রত নেয়। সেই নিয়মানুবর্তীতাকে তার জীবনের অভ্যাস করে তোলে। কিন্তু ''অভ্যাস আমাদের নিজের মনের তুচ্ছতা দ্বারা সকল মহৎ জিনিষকেই তুচ্ছ করে দেয়। সে নাকি নিজে বদ্ধ এইজন্য সে সমস্ত জিনিষকেই বদ্ধ করে দেয়'' লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ। সেও তো এক অর্থে জীবনের বন্দীত্বই। বদ্ধতায় আনন্দ নেই। আনন্দ তো মুক্তিতে। কিন্তু মুক্তির বাসনায় কঠোর বৈরাগ্যের বাঁধনে নিজেকে বন্দী করে যে সাধক সাধনা করে চলেছেন, তিনিও কি এই মুহূর্তে উপভোগ করছেন জীবনের স্বাভাবিক আনন্দ? না কি অনাবশ্যক কৃচ্ছসাধন, জীবনধর্মের মূলে আছে যে আনন্দ, তাকেই ব্যর্থ করে দিচ্ছে! তাই তো জীবনের কবির সোজাসাপটা কথা - ''বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়। অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময় লভিব মুক্তির স্বাদ''।

বন্দী থেকেও মুক্তির আনন্দ। সেটা সম্ভব হতে পারে তখনই, যখন মানুষ মনের দাসত্ব থেকে নিজেকে মুক্ত করে, জীবনকে বরণ করে নেবে। ''মনেরে আজ কহ যে, ভাল মন্দ যাহাই ঘটুক সত্যকে লও সহজে''। জীবনের থেকে বড় সত্য আর কিছু নেই। তাই 'সত্যকে মেনে নেওয়া মানে জীবনের সঙ্গে থাকা। আমরা যেন সবসময় ভয় নিয়ে বেঁচে আছি। প্রতি মুহূর্তে জীবন যেন 'জুজু' হয়ে আমাদের ভয় দেখাচ্ছে। ভয়ের সঙ্গে দোসর হয়ে আসছে লোভ, রাগ এবং অন্য সব আবেগ। প্রতিদিনের জীবন উপভোগের পথে এরাই তো বন্ধন! এর মানে নিশ্চয়ই এই নয় যে, মানুষের উচ্চাকাঙ্খা থাকবে না! নিজেকে সীমাবদ্ধ না ভেবে, নিজেকে অতিক্রম করে ক্রমশঃ নিজের অবস্থানকে উন্নত করা এ তো মানবজীবনেই সম্ভব। এইখানেই তো মানুষের মহত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব। কিন্তু সেটা করতে গিয়ে নিজেকে আর একটা ঘেরাটোপের মধ্যে বন্দী করে ফেলাটাও কোন কাজের কথা নয়। অন্যের বা নিজের কোন ক্ষতি না করে জীবনের প্রতিটা মুহূর্তকে উপভোগ করতে পারাটাই আসল সফলতা। সেটা তখনই সম্ভব যখন আমরা নিজেদেরকে অন্তরের বন্দীদশা থেকে মুক্তি করে সত্যকে মেনে নেব। আর এটা যখন সম্ভব হবে, তখন কোনও ভাইরাস, কোনও যুদ্ধভয়, কোনও অনাগত আশঙ্কা বা অপ্রাপ্তি আমাদের জীবন উপভোগের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। ভিতরের বন্দীদশা থেকে মুক্ত হয়ে আমরা যে এখন প্রকৃতই স্বাধীন।

জেলখানা মানেই উঁচু পাঁচিলে ঘেরা বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন খুপচি ঘর। ফিনল্যাণ্ডের 'সুয়োমেনলিনা জেল' এর ব্যতিক্রম। এই জেলখানা শুধু একটা বেড়া দিয়ে ঘেরা।

বন্দী বীর

জহর চট্টোপাধ্যায়

লকডাউন, কনটাইনমেন্ট, কোয়রেন্টাইন শব্দগুলো এখন বাঙ্গালীর শব্দভান্ডারের নতুন সংযোজন। ছোটোরাও এই শব্দগুলো চিনে গিয়েছে। বাঙালী এখন গৃহবন্দী। এই পরিস্থিতি নতুন হলেও বন্দী জীবন বাঙালীর নতুন নয়। বাঙালী চিরকালের ঘরকুনো। 'ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড়' ছেড়ে সে খুব বেশী বেরোতে চায় না, আর এখন তো না বেরোনোটাই স্বাভাবিক হয়ে গেছে। বাঙালীর কিছু স্বকীয় বন্দীত্ব আছে। বাঙালী কিছু ভ্রান্ত ধারণা আঁকড়ে বলা ভালো তার মধ্যে বন্দী হয়ে রয়েছে। তার একটি হল, 'গাছের প্রাণ আছে আবিষ্কার করেছেন জগদীশচন্দ্র বসু'। দীর্ঘদিন শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত থেকেও এই ভুল শোধরাতে পারিনি, বরং বিজ্ঞ মানুষজন এই ভুলটাকে সর্বসমক্ষে জাহির করে চলেছেন। এও এক বন্দীদশা। এমন ভ্রান্তি যেমন বহু আছে, তেমনই আছে বহু সুখস্মৃতি যা বন্দী হয়ে আছে বাঙালির ঘরে ঘরে। শরৎ মানেই সেই বন্দী স্মৃতিকে ক্ষণিকের মুক্তি দেওয়া। এখন বাক্স তোরঙ্গ সবার বাড়িতে না থাকলেও, পোষাকের সাথে বন্দী স্মৃতি কিছু কম নেই। শাড়ি কাপড় জামার সাথে যে গল্প লেগে থাকে, মনের মধ্যে বন্দী হয়ে থাকা স্মৃতিরা প্রজাপতির মত বাক্স বা আলমারির ডালা খুলতেই বেরিয়ে পরে। বাৎসরিক এই স্মৃতিরা প্যারোলে মুক্তি পাওয়া বন্দীদের মতই আবার বাক্স বা আলমারিতে বন্দী হয়ে যায়। চাওয়া না চাওয়া নানা বন্দীদশা নিয়েই বাঙালীর যাপন কথা লেখা হয়ে চলেছে। দুর্গাপুজোর উৎসবেও বাঙালী নিজেকে বন্দী করেছে নানান নিয়মে। সে ধর্মীয় আচার আচরণেই শুধু নয়, খাওয়া পড়াতেও আছে বন্দীদশা। অষ্টমীর সকালে পুষ্পাঞ্জলি, কিশোরীর অনভ্যস্ত শাড়ি পড়া, দুপুরে নিরামিষ রান্না, বাড়িতে বাড়িতে লুচি আলুর দম, ছোলার ডালের সার্বজনীন পদ, আবার নবমীতে মাংস ভাত। সব নিয়েই বাঙালী বন্দী হয়েও বীরের মত ছিল, কারণ এই বন্দীদশাই আসলে বাঙালীয়ানাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। তাই মহালয়ার ভোরে 'মহিষাসুরমর্দ্দিনী' শোনার জন্য বছরভর বোবা হয়ে থাকা রেডিওটাকে বন্দীদশা থেকে বের করে আনে। এসবই ঠিক ছিল, কিন্তু অর্থনৈতিক বন্দীদশাটা বাঙালীকে কাহিল করে দিয়েছে। তাই আজ বহু মানুষেরই উৎসবের আনন্দে মাতার সামর্থ নেই, প্রতিদিনের ক্ষুন্নিবৃত্তির আয়োজন করাই তার কাছে মুক্তির স্বাদ। যার সামর্থ আছে পর্যাপ্ত, সে তো উৎসব থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকবে না, তার তো প্রতিবারের মতই সব চাই। তাই কেউ কেউ যেমন উৎসবে মাতবে, অনেকেই তখন উৎসব থেকে মুখ ফিরিয়ে স্বেচ্ছায় নিজেকে বন্দী করে রাখবে। শুধু রোগের ভয়, আতমারির আতঙ্ক নয়, সামর্থহীনতাও উৎসবপ্রিয় বাঙালীর একটা বড় অংশকে বন্দী করে রাখছে।

ব্যক্তিগত কারণে গত কয়েক বছর আমি স্বেচ্ছাবন্দী। প্রথমটা মায়ের চলে যাওয়া। সর্বদা কাজ নিয়ে থাকা সবার প্রিয় ছটফটে মানুষটা জীবনের শেষ ছ'টা মাস বিছানায় বন্দী হয়ে ছিল। ক্যানসার কুঁড়ে কুঁড়ে খেয়েছে, অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করেছে, মায়ের যন্ত্রণামুক্তি আমার জীবনে শূণ্যতা এনেছে। অমার সমস্ত সৃজনশীল কর্মের উৎসাহদাত্রী ছিল মা। যে কোনো লেখার প্রথম পাঠক মা, যা কিছু বানাতাম প্রথম মাকেই দেখাতাম। পুজোর দিনগুলো মায়ে-পোয়ে ঘরে বসে সিনেমা দেখেই কাটত। পুজোর বাজার বলতে আমাদের ছিল শারদীয়া বই আর সিনেমার ডি.ভি.ডি.। একবার পুজোর ছুটিতে কিশোর কুমারের ত্রিশটা সিনেমা দেখেছিলাম দুজনে। বড় পর্দায় সিনেমা দেখতে গেলেও মাকে নিয়ে যেতাম। কলেজে পড়ার সময় রাজ কাপুর মারা গেলেন। আমার কলেজ যাওয়ার পথে পড়ে 'গ্রেস' সিনেমা, সেখানে সাত দিনে রাজ কাপুরের সাতটা ছবি দেখাবে। সিনেমা দেখে মা'কে বাড়ী ফেরার বাসে তুলে দিয়ে আমি কলেজে যেতাম। মায়ের সাথে শেষ সিনেমা দেখলাম নন্দনে, 'ডবল ফেলুদা'। তার পর থেকে ঘরে বসেই সিনেমা দেখি। এখন তো নানা ব্যবস্থা হয়ে গেছে ছবি দেখার, তাই বাইরে যেতে হয় না।

দ্বিতীয় যে কারণে বন্দী থাকা সেটা হল পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি। অবসর এখন খুবই কম, তাই ছুটি পেলে ঘরে বিশ্রাম নিতে, বই পড়তে বা ছবি দেখতে ভালো লাগে।

নিজের লেখা, আঁকা, কম্পিউটারের কাজ নিয়ে সময় কেটে যায় বা বাইরে যাওয়ার সময় থাকে না। লকডাউনে অনেকটা অবসর এনে দিয়েছিল। আমি গৃহবন্দী থাকায় অভ্যস্থ বলে আমার বিশেষ অসুবিধা হয় নি। যেটা অসুবিধা হচ্ছিল সেটা হল সবাই মিলে একসাথে ঘরে থাকা। আমার বন্দীদশা একা থাকাতেই। শনি, রবি বা ছুটির দিনগুলো বেশিরভাগ সময়টা আমি ঘরে একাই কাটাই। অসহ্য অবস্থাটা শুরু হল আমফান ঝড়ের পর। জল নেই, ইলেকট্রিক নেই, নেট নেই — কেমন পাগল পাগল অবস্থা। প্রচণ্ড বিরক্ত লাগছে। এবার সত্যিকারে নিজেকে বন্দী মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে আমাকে কেউ বেঁধে রেখেছে। শরীরে বেশ কিছু রোগ বাসা করেছে, তারাও বন্দী হয়ে রয়েছে। মুক্ত হয়ে আমাকে মুক্তি দেওয়ার কোনো ইচ্ছাই তাদের নেই। কীভাবে এই অবস্থা কাটিয়ে ওঠা যায়! আমি অন্য রাস্তা নিলাম। লকডাউন ও দুর্যোগের কারণে আমার আদরের ভাইঝির সাথে সরাসরি যোগাযোগ নেই অনেকদিন। সেটা মনোকষ্টের আর এক কারণ। তাই ভাইঝির নানা কথা নিয়ে লিখতে শুরু করলাম। এভাবে লিখতে গিয়ে আমি পেয়ে গেলাম আমার 'খুকু'কে। নানা সময়ে রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ এসেছে জেঠু-ভাইঝি'র মধ্যে। ছোট্ট মেয়ের অবোধ প্রশ্ন, কখনও অবাক করা উত্তরে আমি রবীন্দ্রনাথকে নতুন করে খুঁজলাম। সৃষ্টি হল একঝাঁক পদ্য, যার শীর্ষক হল 'খুকুর রবীন্দ্রনাথ'। লিখে আনন্দ পেলাম, মনের বন্দীভাবটা আস্তে আস্তে কাটতে লাগল। বুঝলাম লেখাটা একটা অভ্যাস, লিখতে শুরু করলে লেখা আসতে থাকে। অনেকদিন না লিখলে লেখার প্রবাহ শুকিয়ে যায়।

লকডাউনে শিখলাম অনেক কিছু। ঘরবন্দী অবস্থাতেও স্বাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চালিয়ে গেলাম সকলকে সঙ্গে নিয়ে। ভালো ভালো কিছু অনুষ্ঠান হল। অনুষ্ঠানের প্রয়োজনেই অনেক না জানা জিনিস শেখা হল। তার সঙ্গে নিজের কল্পনাশক্তি ও সৃজনশীলতা মিশিয়ে দিতেই সবার ভালোলাগার জিনিস তৈরী হল। আবৃত্তি ও শ্রুতিনাটক শিক্ষার প্রতিষ্ঠান 'সুর ও কথা'র সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছি। তাদের খুদে শিল্পীদের জন্য প্রায়ই কলম ধরতে হয়। তেমনভাবেই নজরুল ইসলাম, বিদ্যাসাগর বা বৃষ্টিকে বিষয় করে কবিতা লিখতে হয়েছে। বিষয় হিসাবে দুর্গাপুজো বা শারদীয়ার বৈচিত্রের অভাব নেই। ওদের জন্যই দুর্গাপুজো নিয়ে একটা মজার কবিতা লিখে ফেললাম। মা দুর্গা এবার চার ভাইবোনকে মর্ত্যে যেতে নিষেধ করছেন কিন্তু তারা শুনতে চাইছে না, যাবেই বলে বায়না ধরেছে। কবিতাটি এরকম —

মহালয়ার সকালবেলা, শিবঠাকুরের ঘরে,
লক্ষ্মী-কেতো-গণশা-সুরো তর্ক দিল জুড়ে।
বাক্স-বেডিং গুছিয়ে রেডি, যাওয়ার জন্যে মর্ত্যে,
মা বললেন, ''এবার গেলে, ফিরবে না বেঁচে বর্ত্যে।
ঘরেই থাকো এ কটা দিন, দরজা-কুলুপ এঁটে,
গাড়ি ঘোড়া মলছে কমই, কে আর যাবে হেঁটে?
নাক মুখ সব ঢাকতে হবে, টুকরো কাপড় দিয়ে,
হাজা ধরে মড়ব নাকি, বারবার হাত ধুয়ে।
বাইরে থেকে যে ই আসুক, চোদ্দ দিনের মামলা,
বন্দী করে একলা ঘরে রাখবে ঠ্যালা সামলা।
কী দরকার সাধ করে আর সামলানো এ ঝক্কি,
নিজের ভালো চাইলে মর্ত্যে যাবে কোন লোক কি?
মায়ের কথা শুনেও তাদের কমল না তো বায়না,
বছরকার এই খুশি-মজা বাদ দিতে তারা চায়না।
মা বোঝালেন হাত বুলিয়ে সবার মাথায় গায়,
''এবারটা বাদ দাও সবাই, আমি নিরূপায়।
আমারও কি লাগছে ভালো বলতে এসব কথা!
যাব না আর মর্ত্যধামে, ভাবতে লাগছে ব্যথা।
সবাই মিলে মানলে নিয়ম জিত হবে নিশ্চিত,
ঢিলে দিলেই হতে পারে হিতে বিপরীত।
মায়ের আদেশ মনে করেই বলছি যা তা শোনো,
পরের বছর ডবল মজা, বাঁচলে এবার যেনো।''

বন্দীদশা থেকে কিছুদিন বাদে নিশ্চয়ই মুক্তি ঘটবে। তখন আজকের দিনের সব কিছুই বন্দী হবে মনের ঘরে। রয়ে যাবে আমার এই লেখাগুলো, হয়ত তারা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়বে, আগামীকে জানাবে কীভাবে আমরা অতিমারীর মারণ সময় কাটিয়েছি। এই পরিস্থিতিতে সুস্থ স্বাভাবিক থাকতে পারাটাই বীরত্ব। তাই আজ আমরা প্রত্যেকে এক একজন বন্দী বীর।

মুক্তি

সৌরভশঙ্কর বসু

লেকের ধারে স্নিগ্ধ সকালের মনোরম পরিবেশে প্রাতঃভ্রমণ সেরে বেঞ্চে বসে জিরিয়ে নিচ্ছেন চার বৃদ্ধ। চারিদিকে মহামারীর প্রকোপ একটু কমতে থাকায় লকডাউন শব্দটা একটু কম ব্যবহার হচ্ছে এখন। মানুষ আবার আগের জীবনে আস্তে আস্তে ফিরে আসছে। তাই প্রায় সাতমাস পর আবার আতঙ্ক কাটিয়ে চার বৃদ্ধ শীতের শুরুতে প্রকৃতির আমেজ নিতে লেকের মাঠে এসেছেন। মন খুলে গল্প জুড়েছেন অনেকদিন পর। বিষয় খুব স্বাভাবিক ভাবেই লকডাইনে গৃহবন্দী জীবনের বর্ণনা। শিশির ভেজা ঘাসে খালি পায়ে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ'ই প্রাক্তন সাংবাদিক সুপ্রকাশবাবু শিশুর মতো হাততালি দিয়ে বলে উঠলেন ''আহঃ মুউউকতি'' উৎকুল্ল চিত্তে নির্মলবাবু গেয়ে উঠলেন ''আমার মুক্তি ধুলোয় ধুলোয় ঘাসে ঘাসে''। সরকারী অফিসে থাকাকালীন প্রতিটি অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী সংগীত গাইতেন নির্মলবাবু। এই মুক্ত প্রকৃতিতে তিনি আর সামলাতে পারলেন না। দরাজ গলায় গেয়ে উঠলেন। আর খানিক আড্ডা গান ও সকালের প্রথম চা টা তৃপ্তি করে খেয়ে বাড়ীর পথ ধরলেন চার বন্ধু।

(২)

''আমি বাড়ী যাব। আমার মাকে ডেকে দাও। আমি এখানে থাকব না'' — তীব্র প্রতিবাদ করে কেঁদে উঠেছিল একটা চার বছরের বাচ্ছা। তখন স্নেহছায়া অনাথ আশ্রমের কর্ণধার, সবার প্রিয় সুনন্দা সেন ছোট্ট শিশুটিকে কোলে নিয়ে চোখ মুছিয়ে দিয়ে বাগানে নিয়ে এসে ঘুরতে ঘুরতে বলেছিল ''বাবা, আজ থেকে এটাই তোমার বাড়ী তোমার মা আমার কাছে তোমাকে দিয়ে গেছেন''। গলায় জাদু ছিল নাকী স্নেহ, শিশুটি বুঝতে পারেনি। শুধু বুঝেছিল ইনি ভালো। শিশুটি কান্না ভেজা চোখে জিজ্ঞেস করেছিল — ''আমার মা কোথায়?'' ''ভালো মা''। উত্তর এসেছিল — ''ওই দেখ বাবা, তোর মা তারা হয়ে গেছে''। শিশু হলেও সে বুঝেছিল যে তার মা ফিরে আসবে না। কারণ ঠাম্মিও একদিন তারা হয়ে গেছিল। আর ঠাম্মি ফিরে আসেনি।

ও হ্যাঁ, সুনন্দা মিস কখন যেন অনিন্দ্যর ''ভালো মা'' হয়ে গেছে। অনিন্দ্য বুঝতেও পারেনি। এই হোম বা অনাথ আশ্রম খুব সুন্দর। বাগানে গাছ ফুল-এ ভর্তি। ছোট মাঠ আছে। বিকালে খেলতে পায়। ঘর এর মধ্যে দেওয়ালে কার্টুন আঁকা। দিনে একবার আধঘন্টার জন্য টিভি দেখে। কার্টুন নয়তো দেশ বিদেশের বিভিন্ন জায়গার অনুষ্ঠান। পড়ার দিদিমনিগুলো একদম ভালো না। শুধু পড়ায় ও গম্ভীর। কিন্তু ভালো মা তো অমন না। কিসুন্দর পড়া বুঝিয়ে দেয়, বাগানে গাছ আর পাখি চিনিয়ে দেয় বিকালে। একটুও বকে না।

(৩)

বেশ গরম এখন। সদ্য মাধ্যমিকের রেজাল্ট বেরিয়েছে। কাগজে ফলাও করে কৃতীদের খবর দিয়েছে। একটা খবরে চোখ আটকে গেল অনিন্দ্য সেন এর। ''অনাথ আশ্রমে পড়ে মাধ্যমিকে ষষ্ঠ স্থান .....''। কানে এল টিভিতেও খবরটি বলছে। ''হোমের বাচ্ছার আকাশ স্পর্শ.....''। কান ভোঁ ভোঁ করছে তার। হঠাৎ মনে হল তাকে ঘিরে একদল ছেলের চিৎকার, মজা করা, রসিকতা করা এক টাই

শব্দ — ''হোমের ছেলে''।

কাঁদতে কাঁদতে ভালো মার কাছে এসে বলেছিল ছোট অনিন্দ্য — ''ওই স্কুলে পড়ব না। ভালো মা, আমাকে সবাই হোমের বাচ্ছা বলে কেন'' উত্তর দিতে পারেননি ''ভালো মা''। শুধু বলেছিলেন — ''ওদের থেকে অনেক ভালো হয়ে দেখিয়ে দিস বাবা, যাতে ওরা আর বলতে না পারে তোকে।''

— হ্যাঁ। অনিন্দ্য সেন অনাথ। কিভাবে হোমে এল জানেনা। শুধু জানে এটাই ওর বাড়ী। কিন্তু এই বাড়ীতে যেন পরাধীন। পুকুরে ডুব সাঁতার কাটতে পারেনা, দুপুরে গাছে উঠে তেঁতুল পাড়তে পারেনা, মাঠে সাইকেল নিয়ে রেস করতে পারেনা, বর্ষা কালে স্কুল ফেরত কাদা মেখে ফুটবল খেলতে পারে না। রাগ হয় বাকীদের দেখে। অভিযোগ করে ভালো মাকে। মা খুব শান্ত কিন্তু দৃঢ় ভাষায় বলে — ''মুক্তি পেতে চাও, পাবে। তার আগে যোগ্য হও,'' ভেবেছিল যোগ্য সে হবেই। মুক্তি তাকে পেতেই হবে।

(৪)

গ্যালিফ স্ট্রীট এ রোববার হাট বসেছে। একজন অনেক দাম দিয়ে সব পাখি কিনলেন। বোঝাই যাচ্ছে বেশ রইস আদমি। দোকানীরা বেশ সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে দেখছে তাকে। পাত্তা দিলেন না বছর পঁয়ত্রিশের সেই ব্যক্তি। সোজা গেলেন সুন্দরবন। সাথে গাড়ি ভাড়া করে সেই কয়েকশো পাখি। এক এক করে ছেড়ে দিলেন সবাইকে। বদরি, মুনিয়া, টিয়া, চন্দনা, কাকাতুয়া, ময়না, পায়রা এমনকি দুটি বিদেশী কোয়েল আর ম্যাকাও। আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠলো তাদের কলতান-এ। গাছে গাছে উঠে গেল তারা। গাছে থাকা অন্য পাখিরাও যেন তাদের সাদরে বরণ করে নিল। অদ্ভুত খুশিতে উদ্ভাসিত হল সেই ক্ষ্যাপাটে মানুষটার মুখ। হ্যাঁ, ক্ষ্যাপা, পাগলা, মাথার ব্যামো, ছিটিয়াল এই বিশেষণগুলোই বললো প্রত্যক্ষদর্শীরা। পাগল না হলে কেউ প্রায় চল্লিশ হাজার টাকার পাখি কিনে উড়িয়ে দেয়।

উৎসুকের প্রশ্নোত্তরে সেই ক্ষ্যাপা লোকটি বললেন — ''মুক্তির স্বাদ তোমরা কি বুঝবে হে? খাঁচার পাখি আর হোমের ছেলের মন কি চায় তার তোমরা কি জানো।'' বলে উল্টোদিকে হাঁটা লাগালেন অনিন্দ্য সেন। সেই ছোট্ট অনিন্দ্য আজ প্রায় দশবছর হল সরকারী আমলা। ''ভালো মা'' এর স্নেহ ছায়া থেকে মুক্তি পেয়েছিল ২১ বছর বয়সে স্নাতক হয়ে। অনাথ অনিন্দ্য ''ভালো মা'' এর ভালো ছেলে হয়ে পাশ করেছিল জীবনের সব পরীক্ষায়। ''ভালো মা'' মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন অনিন্দ্যকে। বয়োবৃদ্ধ ''ভালো মা'' কে ছেড়ে যায়নি অনিন্দ্য। সুনন্দা সেনের ছেলে হয়ে শেষদিন অবধি সেবা করেছে অনিন্দ্য সেন। যেদিন ''ভালো মা'' ইহ জগৎ থেকে মুক্ত হলেন, অনিন্দ্য সত্যি বুঝেছিল অনাথ হওয়া কাকে বলে। ''ভালো মা'' থেকে কখন যে ''মা'' হয়ে গেছিল চোখে পড়েনি তার। মা দায়িত্ব দিয়ে গেছিল স্নেহছায়ার। আনিন্দ্যবাবু পালন করেছেন সেই উপদেশ। প্রতিবছর কৃতীদের তালিকায় এই স্নেহছায়ার কোন না কোন আবাসিক নিজের নাম খোদাই করে রাখে।

(৫)

তবে কাজ এখনো বাকী। অনেক চিঠি চাপাটি এমনকি আদালতেও যেতে হবে ওনাকে। শিশুমন, ছাত্রমন কে হোমের বাচ্ছা ও বাড়ীর বাচ্ছায় বিভক্ত করে দেওয়াকে মানতে পারেনা যে মন থেকে। তাঁর ওপরে যে মায়ের আদেশ আছে, শুধু স্নেহছায়া থেকে, শিশুদের বড়ো করা নয়, সমাজকেও ওই বিভাজনের কলুষতা থেকে মুক্ত করতে হবে যে।।

মহিষাসুরমর্দিনী

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

(প্রতিবছর মহালয়ার ভোরে রেডিওতে 'মহিষাসুরমর্দিনী' অনুষ্ঠানটি শোনা বহু বছর ধরেই বঙ্গজীবনের অঙ্গ। নানা কাগজপত্র থেকে আমরা জানি যে অনুষ্ঠানটির মূল কান্ডারী ছিলেন তিনজন - বাণীকুমার, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র ও পঙ্কজকুমার মল্লিক। কিন্তু এই অনুষ্ঠান কীভাবে শুরু হয়েছিল কাদের কাদের হাতে বারবার পরিবর্তিত হয়েছে বাদ্যযন্ত্রী কারা ছিলেন, গায়ক গায়িকাই বা কারা ছিলেন এসবের বিস্তারিত ইতিহাস আমাদের অনেকেরই অজানা। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের এই লেখাটিতে ধরা আছে সেই ইতিহাস। বেতারজগৎ পত্রিকায় ১৯৬০ সালে প্রকাশিত এই প্রবন্ধটি ডঃ অমিত চক্রবর্তীর সূত্রে পাওয়া, যিনি দীর্ঘদিন আকাশবাণীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। পুর্নমুদ্রণের সূত্রে তাঁর প্রতি রইল আমাদের কৃতজ্ঞতা।

মজার ব্যাপার হল বর্তমানে রেডিওতে যে 'মহিষাসুরমর্দ্দিনী' প্রতি মহালয়ার ভোরে প্রচারিত হয় সেটি ১৯৬৬ সালে রেকর্ড করা অনুষ্ঠান অর্থাৎ এক অর্থে এই অনুষ্ঠানটিও পাঁচদশকেরও বেশি বন্দীদশায় আবদ্ধ হয়ে আছে।)

আকাশবাণী, কলকাতা কেন্দ্রের কোনো অনুষ্ঠান যদি বিশেষ স্মরণীয় ব'লে পরিচিতি লাভ ক'রে থাকে, তাহলে শ্রোতাদের মধ্যে অধিকাংশই নিশ্চয় 'মহিষাসুরমর্দিনী' নামে যে অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হয়, সেটিরই উল্লেখ করবেন।

''সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে, যেখানেই বাঙালী সমাজ আছেন ও যেখানেই বেতারযন্ত্র আছে — সেইখানেই অনুষ্ঠানটি শোনার জন্য আগ্রহ প্রকাশ পায়। এই প্রোগ্রাম শোনার জন্য অগণিত শ্রোতা যে কিরূপ কষ্ট স্বীকার করেন, সে সমস্ত বিবরণ শুনলে বিস্মিত হতে হয়।

বাংলাদেশে শারদোৎসবের বার্তা বোধ হয় এই অনুষ্ঠানের মারফৎ সবার কাছে পৌঁছায় ও মহামায়ার আবির্ভাব যে আসন্ন তা এই অনুষ্ঠানই জানিয়ে দেয়। প্রকৃতপক্ষে, এখন এই অনুষ্ঠানটি বাঙালীর জাতীয় অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে, একথা বলা যেতে পারে।

এই অনুষ্ঠানটি কতোদিনের, কি ভাবে এর সৃষ্টি হলো, পূর্বে এই অনুষ্ঠানে কারা অংশগ্রহণ করতেন, শিল্পীরা এখানে কখন আসেন, এটা রেকর্ড মারফৎ প্রচারিত হয় কিনা ইত্যাদি অনেক প্রশ্ন শ্রোতারা করে থাকেন। সকলের আগ্রহ মেটাবার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

১৯২৭ সালের আগষ্ট মাসের ছাব্বিশ তারিখে কলকাতা স্টেশন জন্মগ্রহণ করে। এর পূর্বে টেম্পল চেম্বারে পরীক্ষামূলকভাবে মার্কণি কোম্পানি কিছুদিন ছোট্ট ট্রান্সমিটার ব্যবহার করে ঘন্টাখানেক, ঘন্টাদেড়েক ক'রে সন্ধ্যেবেলায় বেতারবার্তা প্রচার করতেন এবং কলকাতার মাত্র কয়েকজন লোক তা কানে হেডফোন লাগিয়ে শুনতেন।

তারপর ১৯২৭ সালেই ইণ্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানি নামে একটি সংস্থা কলকাতা ও বোম্বাই শহরে বেতার প্রতিষ্ঠান স্থাপন করলেন। একমাস আগে ২৩শে জুলাই বোম্বাই স্টেশনের উদ্বোধন হলো - ঠিক তার কিছুদিন পরে কলকাতা বেতার কেন্দ্র স্থাপিত হলো - ১নং গারস্টিন প্লেসে।

আমরা মুষ্টিমেয় কয়েকজন বাঙালী প্রোগ্রাম চালাই তখন, শ্রোতার সংখ্যা বিরাট ছিল না, অর্থও পর্যাপ্ত ছিল না, বহু কষ্টে ক'রে ও অসাধারণ শ্রম স্বীকার ক'রে ক'জনকে প্রোগ্রাম চালাতে হতো।

আমাদের মধ্যে কর্তা ছিলেন নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার মশাই। তিনি প্রোগ্রাম ডিরেক্টর আর রাইচাঁদ বড়াল ও বর্তমান লেখক তাঁর সহকারী। এর কিছুদিন পূর্বে

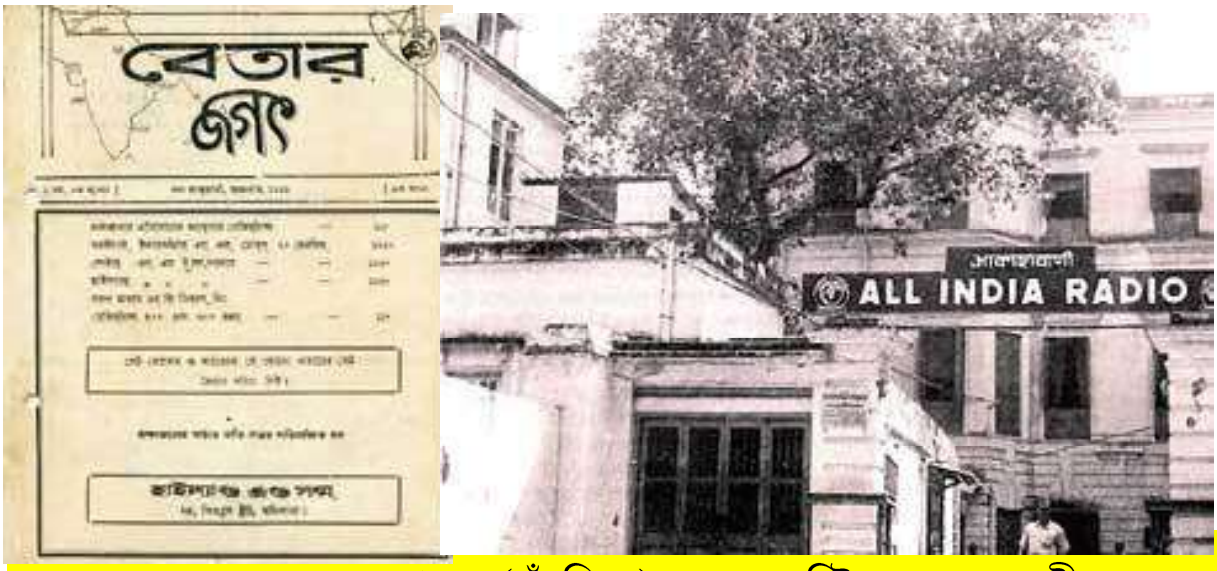

বেতার জগতের প্রচ্ছদ (বাঁ-দিকে) এবং গারস্টিন প্লেসের বাড়ী

বাণীকুমারও এসে যোগদান করেন এখানে ও তার কিছুদিন পরে বেতারজগৎ পত্রিকা প্রকাশ ক'রে আমরা সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক, 'মহাস্থবির জাতক' -এর স্বনামধন্য লেখক প্রেমাঙ্কুর আতর্থী মহাশয়কে এই পত্রিকাটি সম্পাদন করার জন্যে নিয়ে আসি।

প্রেমাঙ্কুরবাবুকে সবাই বুড়োদা বলে সম্ভাষণ করতো। আমাদের সহকর্মী হিসেবে তাঁর মতো সঙ্গী পাওয়ায় আমাদের আসর জমজমাট হয়ে থাকতো। অমন আমুদে লোক খুব অল্পই দেখেছি। লেখক হিসেবে তিনি যেমন পটু আবার লোককে হাসাতে তার চেয়ে দ্বিগুণ দক্ষ। দুপুরবেলায় আমাদের হতো একটা বিরাট আড্ডা - সেখানে সাহিত্য, সঙ্গীত, অভিনয়, গান ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা যে কতক্ষণ চ'লতো তার ঠিক নেই। সে আসরে সাহিত্যিক ও হাসির গানের সুবিখ্যাত গায়ক নলিনীকান্ত সরকার (পরে ইনি বেতারজগতের সম্পাদক হন, বুড়োদা নিউ থিয়েটার্সে ছায়াছবি পরিচালনা করতে চলে যান), সুবিখ্যাত গল্পদাদু অর্থাৎ হাইকোর্টের এ্যাডভোকেট স্বর্গীয় যোগেশ বসু, (ইনিই গল্পদাদুর আসরের প্রতিষ্ঠাতা), সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ ও সঙ্গীত পরিচালক রাইচাঁদ বড়াল, ১৯১১ সালে আই.এফ.এ. শীল্ড বিজয়ী মোহনবাগানের হাফব্যাক ও আমাদের প্রথম বাংলা অনুষ্ঠানের ঘোষক রাজেন সেন, সুপ্রসিদ্ধ পাঞ্জাবী গায়ক পণ্ডিত হরিশচন্দ্র বালী, বাণীকুমার ও আমি সেই সভায় কতো যে গল্প করেছি তার ঠিক-ঠিকানা নেই।

প্রত্যেক আড্ডাধারীকে সপ্তাহে অন্ততঃ একটা ক'রে প্রোগ্রাম সম্বন্ধে নতুন নতুন পরিকল্পনা পেশ করতে হতো। এর উদ্দেশ্য, শ্রোতার সংখ্যা আরো কি করে বাড়ানো যায়। সে সময় সরকার বেতারকে গ্রহণ করেছেন, ইণ্ডিয়ান স্টেট ব্রডকাস্টিং সার্ভিস নামে তা চ'লছে।

হঠাৎ একদিন বুড়োদা বলে উঠলেন, দেখ, রোজ রোজ গান, বাজনা, বক্তৃতা, থিয়েটার, গল্পদাদুর আসর, মহিলা মজলিস এসব তো চলছে — কিন্তু আরও ধাক্কা দিতে হবে শ্রোতাদের।

নৃপেনবাবু হেসে বলে উঠলেন, আর কতো ধাক্কা দেওয়া যায় ভাই, সকাল থেকে রাত অবধি তো এই কটা লোক প্রোগ্রাম চালাচ্ছে -- এর ওপর আবার কি করা যাবে বল?

বুড়োদা বললেন, করা যাবেনা কেন?

ধর, আমরা একদিন রাত দশটা থেকে রাত চারটে পর্যন্ত বড় বড় গাইয়ে বাজিয়েদের নিয়ে একটা জলসা বসালুম। রাত্তিরে যে-সব রাগ বাজালে বা গাইলে জমে, সেইগুলি চালানো হলো - তখনই শ্রোতাদের কাছে একটা চমকপ্রদ প্রোগ্রাম বলে মনে হবে। কোনোদিন হয়তো ভোর চারটে

'মহিষাসুরমর্দ্দিনী'-র সরাসরি রেডিও সম্প্রচারে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

থেকে প্রোগ্রাম সুরু করে দিলুম, সেটাও একটা নতুনত্ব হবে।

অনেকেই বললেন, হ্যাঁ বুড়োদার প্রস্তাবটা মন্দ নয়, এ ধরণের আকস্মিক ব্যবস্থায় আর কিছু হ'ক না হ'ক, একটা নতুনত্ব হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

নৃপেনবাবু বললেন, সেই রকম একটা কি প্রোগ্রাম করা যায় ভাব দেখি - বুড়োর এক্সপেরিমেন্টটাই ক'রে দেখা যাক।

বুড়োদা বললেন, এই তো বাণী রয়েছে - সংস্কৃতের তো আদ্যশ্রাদ্ধ করেছে - ও'ই কতকগুলো বৈদিক শ্লোক যোগাড় ক'রে ফেলুক, আর গান লিখুক, রাই সুর দিক, বীরেন শ্লোক আওড়াক - ভোরবেলায় লাগিয়ে দাও, লোকের লাগবে ভাল।

অনেকে হেসে বললেন, লোকের ভাল লাগুক আর না লাগুক, আমাদের একটা নতুনত্ব করার খেয়াল চরিতার্থ হবে।

বুড়োদা বললেন, কেন, তোমরা কি সন্দেহ কর লোকে শুনবে না?

দু'একজন বললেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, লোকে নিশ্চিন্তে সে সময় ঘুমুবে।

নৃপেনবাবু বিরুদ্ধবাদীদের বাধা দিয়ে বললেন, ঘুমুক গে — নয় আমরাই প্রোগ্রাম শুনবো। ওহে বাণী, একটা কিছু লিখে ফেল। একটু সহজ কিছু লিখ বাপু, নইলে আমরাও প্রোগ্রাম করতে করতে হয়তো ঘুমিয়ে পড়বো।

বাণীকুমার তখনই ভাবতে শুরু করলেন। তখন আমি বললাম, নৃপেনদা, পুজো আসছে আর মাসখানেক বাদে, প্রতি পুজোর সময় আমি এক জায়গায় ঠাকুরের সামনে ব'সে ব'সে চণ্ডীপাঠ করি - খানিকটা সড়গড় আছে। শ্রীশ্রীচণ্ডীর কাহিনী নিয়ে যদি বেশ গান টান, শ্লোক লাগিয়ে একটা প্রোগ্রাম করা যায় তাহলে লোকে পছন্দ করুক না করুক-দু'চারজন যারা ঘুম থেকে ভোরবেলায় উঠে আমাদের প্রোগ্রাম শুনবে তখন তাদের তা ভাল লাগতে পারে হয়তো।

সকলে বলে উঠলেন, হ্যাঁ, বীরেন যা বলছে, বেশ ভাল প্রস্তাব, পুজোর সময় চণ্ডীপাঠ লাগিয়ে দাও।

এর মধ্যে আবার একজন খুঁত ধরলেন, বললেন, কায়েতের ছেলে চণ্ডীপাঠ করলে লোকে কিছু বলবে না তো?

নৃপেনবাবু বললেন, প্রোগ্রাম করবে তার আবার বামুন কায়েত কি হে? আমরা কি হিন্দুর মন্দিরে গিয়ে পুজো করছি? তাহলে এই প্রোগ্রামে যারা বাজাবে তার তো অর্ধেক

'মহিষাসুরমর্দ্দিনী'-র তিন স্তম্ভ — বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, বাণীকুমার, পঙ্কজ মল্লিক

মুসলমান, খুশি মহম্মদ, আলি, মুন্সী সবাই তো বাজাবে, তাহলে তাদের বাদ দিয়ে ব্রাহ্মণদের ডেকে আনতে হয়। তাছাড়া আমরা একটা বিরাট উৎসবের আগে ভূমিকা হিসেব এই প্রোগ্রাম করবো - এতো কার কি বলার আছে? প্রোগ্রামটা আসলে লিখবে তো এক বামুন - কি বল হে বাণী?

বাণীকুমার হেসে বললেন, বটেই তো। ও-সব কথা ছেড়ে দিন না - আমি বীরেন ছাড়া কাউকে চণ্ডীপাঠ করতেই দেব না।

প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল। হপ্তাখানেকের মধ্যে বাণীকুমার কতকগুলো গান লিখে ফেললেন ও পণ্ডিত হরিশচন্দ্র বালী, রাইচাঁদ বড়াল ও পঙ্কজকুমার মল্লিক সেগুলিতে সুর সংযোগ করতে লাগলেন। 'অখিল বিমানে', 'বিমানে বিমানে আলোকের গানে' প্রভৃতি সুর হরিশ বালীর দেওয়া, সাগির খাঁর সুর - ''শান্তি দিলে ভরে''। অবশ্য এ ছাড়া 'মাগো তব বীণে সঙ্গীত প্রেম ললিত' প্রভৃতি অধিকাংশ সুর পঙ্কজের দেওয়া, এবং রাইচাঁদ বড়াল ''নিখিল আজি সকল ভোলে'' — গানটির সুর দেন।

পঙ্কজ সুর তুলে ও সুরারোপ করে তখনকার শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের কণ্ঠে গান তোলাতে লাগলেন - রাইচাঁদও এক বিরাট অর্কেষ্ট্রা পরিচালনার জন্য প্রস্তুত হ'তে লাগলেন - সেকালের সবচেয়ে বড় বাজিয়েরা গানের সঙ্গে সহযোগিতা করতে এগিয়ে এলেন। সারেঙ্গী ধরলেন মুন্সী, চেলো বাজালেন তাঁর ভাই আলী, হারামোনিয়াম খুশী মহম্মদ, দ্বিতীয় বেহালা তারকনাথ দে, ম্যাণ্ডোলীন সুরেন পাল, গীটার সুজিত নাথ, এসরাজ দক্ষিণামোহন ঠাকুর, ডবল বাস শান্তি ঘোষ, বেহালা অবনী মুখোপাধ্যায়, পিয়ানো রাইচাঁদ, অর্গান - ও অন্যান্য আরও পাঁচ ছ'জন বড় শিল্পী বাজনা বাজাবার জন্য তৈরী হলেন। পরে গৌর গোস্বামী, হিমাংশু বিশ্বাস, শৈলেন দাস, অনিল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেক বাদ্যযন্ত্রী যোগ দেন ও পঙ্কজের সঙ্গে সহযোগিতা করেন। এ ছাড়াও অনেকে আছেন বা ছিলেন সবার নাম করা সম্ভব নয়। প্রধান গায়ক পঙ্কজ, বিমলভূষণ, কৃষ্ণ ঘোষ, আভাবতী, মাণিকমালা, প্রফুল্লবালা, বীণাপাণি, প্রভাবতী ও তখনকার কালের যাঁরা শ্রেষ্ঠ গায়ক গায়িকা ছিলেন তাঁরা একক ও কোরাসে অংশগ্রহণ করলেন। সত্যি কথা বলতে কি, পরে এই অনুষ্ঠানে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, জগন্ময় মিত্র, শৈলদেবী, রাধারাণী, শ্যামল মিত্র, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুপ্রীতি ঘোষ, সুপ্রভা সরকার, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, উৎপলা সেন, ইলা ঘোষ, সাবিত্রী ঘোষ, ইলা বসু, সুমিত্রা সেন, প্রভাত, অম্বুজা,

'মহিষাসুরমর্দ্দিনী'-র গানের সুর বাঁধছেন সঙ্গীত পরিচালক পঙ্কজ মল্লিক

রবীন ও অন্যান্য এতো শিল্পী এতোবার অংশগ্রহণ করেছেন যে সবার নাম মনে রাখা সম্ভবপর নয়। পূর্বে পঙ্কজকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সহকারী হিসাবে এবং বিভিন্ন সঙ্গতে মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় সাহায্য করতেন এবং পঙ্কজ দু'বৎসর এই অনুষ্ঠান পরিচালনা না করায় হেমন্ত মুখোপাধ্যায় একবার অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। আর একবার অনুষ্ঠানটি পরিবর্তিত আকারে নতুন সুর ও গান দিয়ে সঙ্গীত পরিচালনা করেন বিজন ঘোষদস্তিদার ও শচীন দাস মতিলাল।

পঙ্কজকুমার মল্লিক দু'বছর অনুপস্থিত থাকাতে শ্রোতৃবর্গের অধিকাংশই তাতে খুশী হন নি - এও অনুভব করেছি। এর শিল্পী পরিবর্তন ঘটাতেও আবার একদল খুশী নয় - এও লক্ষ্য করা গেছে। তবে কয়েক বৎসর সামান্য অদল বদল করায় আবার লোকের মন খুশী হচ্ছে।

অবশ্য বিরুদ্ধবাদী কেউ নেই বা এর সমালোচনা কেউ করেন না, এমন কথা বলি না। অনেকে বলেন, আগে যেমন হতো এখন আর তেমনটি হয় না, আবার কেউ কেউ বলেন মশাই একঘেয়ে হয়ে গেছে, গানটান সব কিছু বদলে দিন, অমুকটা করুন, তমুকটা করুন ইত্যাদি। আমরা সকলের মত নিয়ে বহু অদল বদল করেওছি, তবু কয়েকজন বিরুদ্ধাচরণ এখনও করেন। কিন্তু সমগ্র ভারতবর্ষ থেকে যে অভিনন্দন পাওয়া যায়, তার তুলনায় তিক্ত অসন্তুষ্ট কণ্ঠের নিন্দা, অতি সামান্য ও ক্ষীণ।

একথা সত্য, নূতনত্বের যে আনন্দ প্রথম কয়েক বৎসর এই অনুষ্ঠানটি যুগিয়েছিল তা হয়তো অতি পরিচয়ের ফলে খানিকটা ম্লান হয়ে গেছে তবুও বৎসরান্তে একটি শারদ উষার প্রাক্কালে এই অনুষ্ঠানটি লক্ষ লক্ষ শ্রোতার মনকে আজও ভরিয়ে তোলে।

এই অনুষ্ঠানটির গাম্ভীর্যময় পরিবেশ স্মরণীয় বলে দেশের অগণিত গুণীজন স্বীকার করেছেন - শুধু ভারতবর্ষ নয়, ভারতের বাইরে থেকেও বাঙালী সমাজ এই অনুষ্ঠান শুনে বাংলার শারদ ঋতুর ও বিরাট উৎসবের স্পর্শ পেয়েছেন; একথা পত্র মারফৎ আমাদের জানিয়েছেন বহু লোকে।

গত ঊনত্রিশ বৎসরের প্রত্যেকটি বৎসর কতো সুবিখ্যাত শিল্পী এতে অংশগ্রহণ করে গেছেন - তাঁদের মধ্যে বহুজনকে আমরা হারিয়েছি - বহু শিল্পী অবসর নিয়ে চলে গেছেন। রেকর্ডিং করার সুবিধে থাকলে আজ সেইগুলির মধ্য থেকে

সর্বোৎকৃষ্ট গান চয়ন ক'রে আমরা একটি অপূর্ব অনুষ্ঠান হয়তো করতে পারতুম, কিন্তু আজ তা আর কোনমতেই করা সম্ভব নয়।

আজ মনে পড়েছে সেই প্রথম দিনটির কথা। কি ক'রে সমস্ত অনুষ্ঠানটি একটি সুরে বাঁধা হয়ে গেল নিতান্ত আকস্মিকভাবে, তার ইতিহাসও বড় বিচিত্র।

কথা ছিল যে আমি যখন সংস্কৃত শ্লোক সুরে আবৃত্তি করবো, সেই সময়ে যন্ত্রীরা আমায় সুর দিয়ে সাহায্য করবেন শুধু। তারপর আমি যখন বাংলা গদ্য পাঠ করে যাব, সে সময় তাঁরা পিছনে কোনো রাগ আলাপ করবেন ধীরে ধীরে আবহসঙ্গীত হিসাবে।

রাইচাঁদ বড়াল মহাশয় মুসলমান বাজিয়েদের সেইটে বেশ ভাল করে বুঝিয়ে দিলেন, তাঁরাও সব ব্যাপারটা রীতিমত অনুধাবন করেছেন বলে জানালেন।

যথারীতি প্রোগ্রাম সুরু হলো। আমি শ্লোকাবৃত্তি ক'রে, একটু থেমে বাংলা গদ্য আবৃত্তি আরম্ভ করলুম, ''আজ শুভ শারদ উৎসব , জলে, স্থলে প্রকৃতিতে আনন্দের বার্তা'' ইত্যাদি।

ওদিকে সংস্কৃত শ্লোক ও বাংলার পার্থক্য বুঝতে না পেরে উর্দুভাষী মুসলমান বাদকবৃন্দ ঠিক আমার অনুরূপ কথার সুরে বাজনা বাজিয়ে চললেন। আমি দেখলুম এ তো মন্দ শোনাচ্ছে না - তখন সামান্য সুর রাখলুম গদ্যে, সেটি আরও চমৎকারভাবে মিলে গেল তাঁদের সুরের সঙ্গে - রাইচাঁদ, নৃপেন মজুমদার মহাশয় ও পঙ্কজ সবাই সবিস্ময়ে আমার ও যন্ত্রীদের দিয়ে চেয়ে রইলেন যে এরা করে কি - কিন্তু ব্যাপারটা ভাল লাগছিল সবারই - কিছুক্ষণ পরে বাঙালী যন্ত্রীরাও সুর ভিড়িয়ে দিলেন, তারপরে সে সুরে ভিড়ে গেল গান - আবার আবৃত্তি। সমস্ত জিনিষটা একটা অখণ্ড সুরের প্রবাহে বইতে লাগলো। দু'ঘন্টা ধ'রে প্রোগ্রাম মাতিয়ে তুলল সকলকে। তারপর বেতার অফিসে কি অজস্র অভিনন্দন যে আসতে সুরু করল তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।

নৃপেন মজুমদার মহাশয় খুশিতে ভরপুর হ'য়ে বলে উঠলেন, এ কারুর কৃতিত্ব নয় - সবই মায়ের খেলা ভাই - মা দুর্গাই স্বয়ং যেন পেছন থেকে এসে আমাদের অনুষ্ঠানটিকে সুরে বেঁধে দিয়ে গেলেন। হিন্দু মুসলমান শিল্পীর মিলিত প্রচেষ্টায় ''মহিষাসুরমর্দিনী'' অনুষ্ঠানটি বৈচিত্র্যে ও জনপ্রিয়তায় শীর্ষস্থান অধিকার করল।

প্রথম দু'বছর অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হলো ষষ্ঠীর প্রভাতে - ভোর চারটের সময় অর্থাৎ এখনকার ভোর চারটের চব্বিশ মিনিট আগে। দু'ঘন্টা সময় নির্ধারিত ছিল - তারপর সেটিকে দেড়ঘন্টা করা হয় ও ষষ্ঠীর দিনে অনেক অফিস ছুটি থাকে না - লোকে পুজো উপলক্ষে অত্যন্ত ব্যস্ত হ'য়ে পড়ে - বহু শ্রোতা বাইরে চলে যান, তাই শ্রোতাদের অনুরোধে এটি মহালয়ার প্রভাতে নিয়ে আসা হয়। ছুটির দিন থাকায় লোকে নিশ্চিন্ত মনে অনুষ্ঠানটি শুনে তৃপ্তিও পায়।

এইভাবে সতেরো - আঠারো বছর বেশ কেটে গেল। তখন আবার আর একদল গোঁড়া ধুয়ো তুললেন, ঐ দিন পিতৃপক্ষ, দেবীর বন্দনা ওদিন করা ঠিক নয় - তিথি অনুসারে এই অনুষ্ঠান কর।

কর্তৃপক্ষ আবার তিথি অনুসারে দু-তিন বছর উক্ত অনুষ্ঠান করলেন কিন্তু বহু শ্রোতার যেমন তাতে অসুবিধা ও অস্বাচ্ছন্দ্য ঘটতে লাগলো তেমনি আমাদেরও মনটা খারাপ হয়ে গেল। অবশেষে অজস্র প্রতিবাদ আসতে লাগলো শ্রোতাদের কাছ থেকে। অধিকাংশ শ্রোতা বললেন, প্রথমতঃ এই প্রোগ্রামটির মূল্য ধর্মের দিক থেকে কতখানি তা আমরা জানি না, তবে চিত্তাকর্ষক শারদীয় উৎসবের একটা অঙ্গ হিসাবে আমরা এই প্রোগ্রামকে গ্রহণ করে থাকি। বেতার আমাদের ধর্মে দীক্ষা দিতে আসে নি, এসেছে আনন্দ দিতে, অতএব সেইদিক বিবেচনা করে মহালয়ার ছুটির দিন প্রোগ্রাম চালানো উচিত। তাছাড়া দেবীর বোধন তো বহু পূর্ব থেকেই সুরু হয়ে যায় - সে ক্ষেত্রে ঐ দিন যদি এই অনুষ্ঠান করা হয়, তাতে ক্ষতি কি?

শ্রোতাদের আগ্রহে ও বিশেষ অনুরোধে পুনরায় মহালয়ার প্রাতেই আবার এই অনুষ্ঠানটি প্রবর্তিত হলো। মহিষাসুরমর্দিনী অনুষ্ঠানটি সাধারণ লোকের কাছে এখন ''মহালয়া প্রোগ্রাম'' বলে কথিত হয়ে থাকে।

কিন্তু এই মহালয়ার প্রোগ্রামের পেছনে যে কত বড় ইতিহাস আছে, তা সকলে জানতেন না বলেই এই প্রবন্ধের অবতারণা করলুম। (রচনাকাল - ১৯৬০)

অখ্যাত গ্রাম থেকে খ্যাতির শীর্ষে

কল্যাণ গঙ্গোপাধ্যায়

বীরভূমের এক অখ্যাত প্রত্যন্ত গ্রাম মিরীটি। এখন এই গ্রামের কথা গোটা দুনিয়া জানে। এই গ্রামের বিশ্ববিজয়ী সন্তান, সদ্য প্রয়াত শ্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়, মিরীটির নাম তুলে এনেছেন বিশ্ব মানচিত্রে। ১৯৩৫ সালের ১১ ডিসেম্বর তারিখে এই মিরীটিতেই জন্মেছিলেন ভারতের ত্রয়োদশ রাষ্ট্রপতি শ্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়। তাঁর পিতা কামদাকিঙ্কর মুখোপাধ্যায় ছিলেন বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সক্রিয় সদস্য। পরবর্তীকালে তিনি বিধান পরিষদের সদস্য এবং বীরভূম জেলা কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছিলেন। পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে তিনি ১৯৬৯ সালে কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ নির্বাচিত হন। এরপর দীর্ঘ পাঁচ দশক তিনি সাংসদ ছিলেন। সাংসদ নির্বাচিত হওয়ার আগে তিনি পশ্চিমবঙ্গের নানা জেলার স্কুল ও কলেজে শিক্ষকতা ও অধ্যাপনা করেন। ১৯৭৩ সালে তিনি প্রথম ক্যাবিনেটে যোগদেন। ১৯৮২ সালে তিনি ভারতের অর্থমন্ত্রীর দপ্তর পান। ১৯৮৪ সালে একটি ইউরোপিয় পত্রিকার বিচারে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ পাঁচ অর্থমন্ত্রীর একজন বিবেচিত হন।

২০০৯ সালে তিনি দ্বিতীয়বার ভারতের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব প্যলন করেন। এছাড়াও তিনি দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের রাজনৈতিক জীবনে 'পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান', 'ভারতের বিদেশ মন্ত্রী', 'ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী' র দায়িত্বভারও তিনি সামলেছেন।

তাঁর বর্ণময় রাজনৈতিক জীবনকে অল্প কথায় ধরা সম্ভব নয়, শুধু শ্রদ্ধাজ্ঞাপণের উদ্দেশ্যে এই তথ্যের অবতারণ। আমার সঙ্গে ওনার ব্যক্তিগত স্তরের যে আলাপ তা রাজনৈতিক কারণেই, কিন্তু উনি সেই গণ্ডি নিজেই দূর করে দিয়েছিলেন। নাহলে আমার মত অতি সাধারণ এক রাজনৈতিক কর্মীর পক্ষে তাঁর মত উচ্চতার ব্যক্তির স্যন্নিধ্য পাওয়া সম্ভব হত না। মুর্শীদাবাদ জেলা কংগ্রেসের নানা দায়িত্ব সামলাতে সামলাতে একদিন সুযোগ এল প্রণববাবুকে গ্রথমবার লোকসভা ভোটে জিতিয়ে আনার। ২০০৪ সালে তিনি মুর্শীদাবাদের জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী হলেন, আর আমিও ঝাঁপিয়ে পড়লাম তাঁকে ভোটে জেতাবার কাজে। গ্রামে গ্রামে প্রচারের কাজে তাঁর সঙ্গে ঘোরার সুবাদে তাঁকে কাছ থেকে দেখার এবং তাঁর কাছে আসার সুযোগ পেয়েছি। আজ সে সব দিনের কথা ছবির মত ভেসে উঠছে। বিশ্বের মানচিত্রে তাঁর অধিষ্ঠান, তাঁর মত মানুষের পক্ষে জেলা মুর্শীদাবাদের খড়গ্রাম, জঙ্গীপুর, বহরমপুরের খোঁজ খবর নিতেন, আমার মত আরও অনেক আণুবিক্ষণীক মানুয়ের কথা মনে রাখতেন সেটা তাঁর সীমাহীন মহত্ত্বের প্রকাশ। তাঁর এই মহত্ত্বের কারণে আমার এক বিরল অভিজ্ঞতালাভের সুযোগ হয়। সেটা হল দিল্লীর ঐতিহাসিক রাষ্ট্রপতি ভবনে গিয়ে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি পদ্মবিভূষণ, ভারতরত্ন শ্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁরই 'স্টাডি রুম'-এ দেখা করা। এই সাক্ষাৎ সম্ভব করেদিয়েছিলেন তাঁর পুত্র, তৎকালীন সাংসদ শ্রী অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়।

প্রণব মুখোপাধ্যায় ও অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে লেখক

সেটা ২০১২ সাল। দিনটা এখনও মনে আছে, ২৬ নভেম্বর। আমার ভাগ্নে সঞ্জীব কর্মসুত্রে দিল্লীতে থাকে। সেবার ওর বাসাতেই উঠেছিলাম। দিল্লীতে আমার পরিবার বলতে ভাগ্নে সঞ্জীব, বৌমা জবা এবং নাতনী লাবনী। ওদেরকে সঙ্গে নিলাম। আরও দুজন ছিলেন আমাদের সঙ্গে — রিন্টুবাবু এবং উকিল শেখ। তাঁর কাছ থেকে বাড়ীর লোকের মত খাতির, যত্ন আর আপ্যায়ন পেলাম। এ আমার বিরাট প্রাপ্তি। উনি আজ আমাদের মধ্যে নেই যেমন সত্য, তেমনি আমার স্মৃতিতে তিনি সতত জীবন্ত হয়ে আছেন। রাইসিনা হিলসে তাঁর সাথে কাটানো প্রতিটি মুহুর্ত তো আমার কাছে বিশেষ মুহুর্ত বটেই, তার বাইরেও তাঁর সান্নিধ্য পাওয়া প্রতিটি মুহুর্তই আমার কাছে দামী। বহু গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীত্বে তিনি নিজের যোগ্যতার ছাপ রেখেছেন, প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সমস্ত যোগ্যতা তাঁর ছিল বলেই আমি আজও মনে করি। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, 'হিন্দী না জানলে প্রধানমন্ত্রী হওয়া যায় না।' এ শুধু তাঁর নয়, সমস্ত বাঙালীরই আক্ষেপ। তাঁর বিদেহী আত্মার চীর শান্তি কামনা করি।

খাঁচার পাখি বনের পাখি

উপল পাত্র

''অঙ্গীরা, এই অঙ্গীরা একবার বারান্দায় আয় না রে।'' বছর বারোর মেয়েটির ডাকে উল্টোদিকের ফ্ল্যাটে থাকা সমবয়সী অঙ্গীরা বারান্দায় বেরিয়ে মুখ বাড়ায়।

''তোড়া, আমি টেন মিনিটস পরে আসছি রে। এখন অনলাইনে মিউজিক ক্লাস চলছে। তোর অনলাইন ক্লাস নেই আজ?''

''হ্যাঁ, ছিল তো। হয়ে গেছে। শোন না, বলছি কী আজ বিকেলে থালি বাজাবি? আমরা বাজাব খুব মজা হবে।''

''কেন রে, থালি বাজালে কী হবে?'' অঙ্গীরা জিজ্ঞেস করে। তোড়া বললে, ''তা জানিনা, মা বলল থালি বাজাতে হবে। মনে হয় থালি বাজালে করোনা চলে যাবে। আর আমরা আবার মাঠে নেমে খেলতে পারব, স্কুল যেতে পারব।''

ঠিক এ সময়ে অঙ্গীরার মা এসে ওকে টানতে টানতে ঘরের ভিতরে নিয়ে গেল। তোড়ার মা থাকলে বারান্দায় থেকে এভাবে ডাকাডাকির জন্য ওকে বকুনি খেতে হত নির্ঘাত। ভাগ্যিস মা বাড়িতে নেই।

এখন অনলাইন ক্লাস করতে হচ্ছে বলে বেশি টিভি দেখা বারণ। চোখ খারাপ হয়ে যাবে। মাঠে নেমে খেলা বারণ, বন্ধুদের হাত ধরা বারণ, ওদের সঙ্গে কাছ থেকে কথা বলা বারণ। সবেতেই কেবল বারণ আর বারণ। তোড়া কীই বা করে সারাদিন একা একা। কতক্ষণ আর ড্রয়িং করে, গল্পের বই পড়ে সময় কাটানো যায়।

বাবা অফিসে যায় না, বাড়িতে থেকে অফিসের কাজ করে। মা অফিস যায় সপ্তাহে তিনদিন। কিন্তু কেউই তার সঙ্গে তেমন সময় দেয় না। নিজেদের অফিসের কাজ নিয়ে থাকে সবসময়। দু'জনেই কেমন যেন হয়ে গেছে। একবার মা রেগে যায় বাবার উপর তো কখনও বাবা রেগে যায় মা'র উপর। আর রেগে গেলেই কেউ কারো সঙ্গে কথা বলে না। তখন মা বলে, ''তোড়া বাবাকে বল চা হয়ে গেছে।'' আবার বাবা বলে, ''তোড়া মাকে জিজ্ঞেস কর আমার রুমাল কোথায় রেখেছে।'' মেজাজ ভাল না থাকলে বাবা তাকে তোড়া বলে ডাকে, নইলে প্রিন্সেস।

আগে কিন্তু এরকম ছিল না। মা অফিস থেকে ফিরে ওর সঙ্গে কত গল্প করতো। ওর জন্য কিছু না কিছু কিনে আনতই ফেরার পথে। এখন তোড়া মা'র সঙ্গে কথা বলতেও ভয় পায়। এই বুঝি বকা দেয় মা। বাবা অফিস থেকে ফিরে — 'মাই প্রিন্সেস, কোথায় তুমি' বলে ডেকে আদর করত। এখন সব সময়ে মুখ গোমড়া করে বসে থাকে ল্যাপটপের সামনে। তোড়া বুঝতে পারে না হঠাৎ এসব কেন হল, কী করে হল। আর কতদিনই বা এভাবে চলবে। ঐশিকী, তৃণা, মঞ্জুরী, কৌস্তভ — স্কুলের এই বন্ধুদের সঙ্গে কতদিন দেখা হয়নি। এবারের বার্থডে-তে তোড়া একা একাই কেক কাটল মা-বাবার সঙ্গে। বন্ধুরা এল না, কোন মজা হল না। গিফট, রিটার্ন গিফট কিছুই ছিল না। শুধু মা অনলাইনে একটা ফ্রক কিনে দিয়েছিল জন্মদিনে, ব্যাস।

মন খারাপ হয়ে যায় তোড়ার, জানলায় গিয়ে বসে। দাদু শুয়ে পেপার পড়ছে, ঠাম্মা নিজের কাজ করছে। মা, বাবা দু'জনেই বেরিয়েছে। পুজো আসছে। বাইরে রোদ ঝলমলে আকাশ, রাস্তায় টাঙান পুজোর ফেস্টুনটা হাওয়ায় ফুলে ফুলে উঠছে। এবার পুজোয় ওদের সিমলা যাওয়ার কথা ছিল, ট্যুর বাতিল হয়ে গেছে। অন্য দিনের মত লোকজন নেই রাস্তায়। তবু ওর বয়সী বা তার থেকেও ছোট কয়েকটা ছেলে-মেয়ে ফুটপাতে খেলছে। ওদের কারো মুখে মাস্ক নেই, কারো কারো গায়ে জামাও নেই। আচ্ছা ওদের করোনা হবেনা? ওদের সঙ্গে খেলতে খুব ইচ্ছে করছে তোড়ার।

ঠাম্মা বলল, ''বিবি তোমার কী হয়েছে? একা একা জানলার ধারে বসে কেন?'' ঠাম্মা ওকে আদর করে বিবি বলে ডাকে।

''মা ফেরার আগে স্নান করে এসো, যাও। আমি ফল কেটে রাখছি, এসে খেয়ে নিও।''

রাস্তার বাচ্ছাগুলোকে দেখিয়ে তোড়া বলে, ''ঠাম্মা দেখ, ওরা কেউই মাস্ক পরেনি, কেমন খেলছে। আমি খেললেই কেন করোনা হবে?'' ঠাম্মা কিছু বলতে যাচ্ছিল, বেল বাজল।

''বিবি, দেখতো। মা এলো বোধ হয়।''

দরজা খুলে তোড়া দেখল কাজের মাসি মালতী, সঙ্গে ওর মেয়ে রিন্টি। রিন্টি তোড়ার থেকে বছর খানেকের ছোট, ওকে দেখে হাসল। মালতী মাসি ওকে ঘরের বাইরের সিঁড়িতে বসতে বলে নিজে ভিতরে এল। রাস্তার জামা-কাপড় ছেড়ে অন্য পোশাক পরলো।

''তুই ভেতরে আয় না।'' তোড়া ডাকল।

''না, তোমার মা বকবে।'' রিন্টি জবাব দিল।

''মা দোকান গেছে, আসতে দেরী হবে, আয়না ভিতরে। আমরা ততক্ষণ খেলি।''

মালতী জানে বৌদির মেজাজ। তাই সে মেয়েকে সাবধান করে বলল, ''না, তুই ভিতরে একদম আসবিনি। মামী বকবে। বাইরে বোস।''

রিন্টি ভয়ে দু'পা পিছিয়ে গেল। কোন অপরাধে তাকে মামী বকবে বুঝতে না পেরে সে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল মায়ের মুখের দিকে।

তোড়া বলল, ''ঠিক আছে, তুই ওখানেই থাক। ওখান থেকেই খেলব আমরা।''

ফ্ল্যাট বাড়িতে বাইরে থেকে বসার ঘরে ঢোকার একটা দ্বিতীয় দরজা থাকে। তোড়া সেটা খুলে নিজে বসল ঘরের ভিতরে আর রিন্টি বসল ঘরের বাইরে সিঁড়ির ল্যান্ডিং-এ। মধ্যের চৌকাঠ শিশু দুটির মধ্যে নিয়ম রক্ষার প্রাচীর তৈরী করল।

তোড়া তার খেলার সরঞ্জাম ভর্তি বাক্স নিয়ে এলো। রিন্টিকে বলল, ''তুই মাস্ক পরিস নি কেন?''

রিন্টি উত্তর দিল, ''আমার 'মাস' নেই।''

''মাস নয় মাস্ক।'' তোড়া সঙ্গে সঙ্গে সংশোধন করে বলল, ''দাঁড়া আমি আনছি।'' মায়ের কিনে আনা সুন্দর রঙচঙে মাস্ক একটা নিয়ে এসে বলল, ''তুই এটা পরে নে।''

''না, মামী বকবে।''

তোড়া বলল, ''কিছু হবে না। মাস্ক না পরে থাকলেই বরং মা বকবে।'' দাঁড়া তোর হাত দুটো স্প্রে করে দিই।''

রিন্টির হাতে স্যানিটাইজার স্প্রে করে বলল, ''তোর বুঝি স্কুল নেই।''

রিন্টি তার ছোট্ট হাতদুটো ঘষে নিয়ে নাকের কাছে ধরল। ''কী সুন্দর বাস গো তোড়া দিদি!

''কী বললাম কানে গেল না? তোর স্কুল নেই?'' তোড়ার গলায় যেন ধমকের সুর।

''না, ইস্কুল বন্ধ। তোমার খেলার 'বাক্স'টা খোলো না তোড়া দিদি, কী আছে দেখি?'' রিন্টি খেলার জন্য অধীর হয়ে ওঠে।

''সারাদিন তবে কী করিস তুই? তোড়া জানতে চায়।

''আমরা সবাই বটতলার মাঠে সকাল থেকেই খেলি।''

''কী খেলিস রে তোরা?''

''অনেক কিছু — লুকোচুরি, গোল্লাছুট, আমপাতা, রুমালচোর ..... পাড়ার সব মেয়ের ছেলেরা মিলে .....।''

''সারাদিন যে খেলিস মা বকে না?'' তোড়া আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করে।

''বকবে কী করে? মা তো সকালে কাজে চলে যায় .....।

''তাহলে পড়িস কখন?''

''বিকেলে। দিদিমণি পড়ায় মোবাইলে। আমরা সবাই দিলুদের বাড়ি পড়তে যাই। আমাদের তো মোবাইলে নেট নেই। দিলুদের আছে। বাবা বলেছে পুজোর সময় নেট মোবাইল কিনে দেবে। তখন আর কোথাও যেতে হবে না।

''তোর কী মজা রে! কেমন খেলতে পাস, আমি একদম খেলতে পাই না। নীচে খেলার মাঠে নামাও বারণ। একা একা বসে থাকতে বোর হয়ে যাই।''

''কেন মাঠে খেলতে যেতে পার না কেন? ওখানে স্লিপ আছে, দোলনা আছে, ঢেঁকি আছে ...।'' রিন্টি জানতে চায়।

''করোনা হবে বলে বাবা যেতে দেয় না। করোনা হলে তো মানুষ মারা যায়। জানিস, আমার মায়ের ন'কাকা করোনায় মারা গেছে।''

''বিবি তুমি স্নানে গেলে না। মা এসে পড়লে তোমাকেও বকবে আর আমাকেও বকবে।'' ভিতর থেকে ঠাম্মা বলে।

''প্লিজ ঠাম্মা, একটু খেলি না রিন্টির সঙ্গে। ও তো রোজ আসে না।''

ইতিমধ্যে রিন্টির খেলনার বাক্স খুলে ফেলেছে। বার্বি পুতুলগুলো দেখে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে ও। ওর মুখ থেকে আপনিই বেরিয়ে আসে, ''কী সুন্দর দেখতে! কী সুন্দর চুল আর চোখ গো তোড়া দিদি! এ বেশ আমার মেয়ে, তোমার ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেব।''

তোড়া আশ্চর্য হয়ে বলে, ''বিয়ে? সে তো বড় হলে করে। ও অনেক ছোট। ও এখন স্কুলে পড়ছে, তারপর কলেজ, ইউনিভারসিটি যাবে, তারপর চাকরি .... তারপর ....।''

তারপরের ব্যাপারটা বলতে তোড়া লজ্জা পাচ্ছে। মিমি পিসি শোভন পিসোর সঙ্গে অনেকদিন ডেটিং করার পর বিয়ে করেছে। স্কুলের বন্ধু আশিকি বলেছে বিয়ের আগে ঘোরাঘুরি কে 'ডেটিং' বলে।

তোড়া বলল, ''রিন্টি তুই বরং মিস হয়ে ওকে পড়া, আর আমি স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল হই।''

রিন্টির এই প্রস্তাব পছন্দ হয় না। সে তাড়াতাড়ি বলে, ''তুমি মিস হও আমি ওর মা হই।''

''মা হবি? এত ছোটরা মা হয় নাকি? আর মায়েরা কী করে

তুই বুঝি সব জানিস?'' তোড়া অবাক হয়।

''জানি তো। মেয়েকে চান করায়, খাওয়ায়, ঘুম পাড়ায়। তারপর রান্না করে, ঘর ঝাড়ু দেয়, বাসন মাজে .....। মায়ের অনেক কাজ।'' রিন্টি প্রায় মুখস্থ বলে যায়।

তারপর রিন্টির সঙ্গে তার মেয়ের কাল্পনিক কথাবার্তা চলে। তাকে স্নান করায়, বুকের কাছে ধরে দুধ খাওয়ায়, ঘুম পাড়ায়। এ পর্যন্ত ঠিক ছিল। কিন্তু সে যখনই মেয়েকে 'টেঁপি' নামে ডাকল তোড়া প্রতিবাদ করে বলল, ''আমার বার্বির নাম লিজা টেঁপি নয়।''

রিন্টি অবাক হয় তোড়ার প্রতিক্রিয়ায়। সে বলে, ''ঠিক আছে, ওকে লিজা বলেই ডাকব। কিন্তু ওর বাবা কই?''

''ডলের আবার বাবা থাকে নাকি? কী যে বলিস তুই রিন্টি।'' তোড়া অবাক হয় ওর কথা শুনে।

''তুমি জান না, তোড়া দিদি। সবারই মা-বাব থাকে।'' বেশ বিজ্ঞের মত জবাব দেয় সে।

কথাটু শুনে তোড়ার মনে পড়ল আকাশের কথা। আকাশ ওর স্কুলের বন্ধু। ওর বাবা আছে কিন্তু ওদের সঙ্গে থাকে না। স্কুলের পেরেন্ট-টিচার্স মিটিঙে আকাশের বাবা কোনদিন আসে না, কাকিমাই আসে। আকাশ কোনদিন ওর বাবার কথা বলে না। কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে আগে লুকিয়ে কাঁদতো, এখন চুপ করে থাকে।

''ও তোড়া দিদি কী ভাবছ? তুমি বরং মিছিমিছি ওর বাবা হও।''

তোড়া আর পেরে ওঠেনা রিন্টির সঙ্গে। তর্ক করলে সময় বয়ে যায়, খেলা হয় না। মা এসে পরতে পারে। তাই ওর কথায় রাজী হয়ে বলে, ''আমায় কী করতে হবে শুনি?''

''কিছু করতে হবে না। তুমি বেশ কাজ থেকে ফিরেছ। তোমায় খেতে দেব, তুমি বিছানায় শুলে তোমার হাত-পা টিপে দেব। এখন মুখ-হাত ধুয়ে এস দেখি, আমি খাবার বেড়ে দি। এই লিজা কাঁদিসনি, বাবাকে খেতে দি....।'' তোড়া রীতিমত অবাক হয় রিন্টির গিন্নীপনা দেখে।

কাগজের টুকরো কে রুটি বানিয়ে তোড়াকে খেতে দেয় রিন্টি। সঙ্গে আনাজ খোশার তরকারী। তারপর তোড়াকে শুইয়ে সযত্নে ওর হাত-পা টিপতে থাকে। খেলার নেশায় সমস্ত সতর্কতা ভুলে রিন্টি লক্ষণরেখা পার হয়ে ঘরের ভিতরে চলে আসে। অচিরেই দুই নিষ্পাপ শিশুসখি সব বিভেদ নিষেধ ভুলে পুতুল খেলায় মগ্ন হয়ে পড়ে।

শুক্লা এসে দেখে দরজা হাট করে খোলা, তোড়া ঘরের মেঝেয় শুয়ে। রিন্টি ঘরের ভিতরে ওর পাশে বসে ওর পা টিপে দিচ্ছে পুতুলকে কোলে নিয়ে। রিন্টির মুখে ওর কেনা শৌখিন মাস্ক। মেয়েকে মেঝেয় শুয়ে থাকতে দেখে আর মালতীর মেয়েকে ওর পাশে বসে পা টিপতে দেখে ওর মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে।

দুপুরে মেয়ের মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে মালতী বলে, ''বড্ড লেগেছে না তোর? আমি তোকে বারণ করেছিলুম ঘরের ভেতরে না যেতে, কেন শুনলিনি? দেখলি তো মামী কেমন বকল আমায়? পুজোর মুখে কাজটা ছাড়িয়ে দিল। আমি তোকে মারতে চাইনি, মা। কেন গেলি?''

রিন্টি মায়ের বুকে মুখ লুকিয়ে বলল, ''তোড়া দিদিই তো আমাকে খেলতে ডাকল মা, আমি তো যেতে চাইনি।

''তোর লেগেছে না?'' মালতী জিজ্ঞেস করে মেয়েকে।

চোখের জল মুছে রিন্টি তাড়াতাড়ি মাথা নেড়ে বলল, ''মা লাগেনি। মা তোমার কাজ চলে গেল?''

''ও নিয়ে তুই ভাবিস নি, আবার কাজ পেয়ে যাব। গতর খাটালে আবার কাজের ভাবনা?''

''মা, জান তোড়া দিদিকে মামী মারেনি, কিন্তু ইংরাজীতে কী সব বলছিল। তোড়াদিদি একদম বেরোতে পারেনা, কারো সঙ্গে খেলতে পায় না। একা একা ঘরেই থাকে ..... আমায় বলছিল সব।''

সেই রাতে তোড়ার জ্বর এল। ওকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে শুক্লা বলল, ''রিন্টির সঙ্গে এখন মিশতে বারণ করেছিলাম, তুমি শুনলে না তো?''

''রিন্টিরা সারাদিন খেলে, মাস্ক পরেনা। কই, কিছু তো হয়না ওদের । আমার কি করোনা হয়েছে মা?''

অমঙ্গল আশঙ্কায় শিউরে উঠে সঙ্গে সঙ্গে মেয়ের মুখে হাত চাপা দেয় শুক্লা। ''ওসব বলে না। এমনি একটু জ্বর হয়েছে, ডাক্তারকাকু ওষুধ দেবে, দু'দিনেই সেরে যাবে।''

তোড়া বলল, ''রিন্টিকে মালতী মাসি কত মারল। ওর কোন দোষ নেই। আমিই তো ওকে ডেকেছিলাম। ও আসতে চায়নি, আমার যে একলা থাকতে আর ভাল লাগছিল না। তুমি মালতী মাসিকে কেন বকলে মা শুধু শুধু।''

পরদিন ভোরে মালতী কাজে বেরোচ্ছে, ফোন বেজে উঠল। ''আমি তোড়ার মা বলছি। কাল মাথার ঠিক ছিল না, কী বলেছি কিছু মনে করোনা। তুমি আজ কাজে আসবে। ছাড়লাম।''

অন্তর্জাল

সৌমিতা গোস্বামী সাউ

''মা প্লিজ একটু বোঝার চেষ্টা করো। আমার এতদিনের পরিশ্রমের ফল আজকের এই সুযোগ। শুধুমাত্র কিছু ইমোশনের বশবর্তী হয়ে এই এতভালো সুযোগ কি যেতে দেওয়া ঠিক হবে?'' একরাশ বিরক্তি নিয়ে প্রশ্নটা করলো প্রদীপ। আর যাকে এই প্রশ্নটা করা হল, তিনি কিন্তু নিরুত্তাপ। ছেলের এই এতবড় অপ্রত্যাশিত খবরে আনন্দ পেলেও তার বহিঃপ্রকাশ কেনো যেন কিছুতেই আসছে না আভাদেবীর মধ্যে। তিনি প্রদীপের মা। একমাত্র সন্তানকে এভাবে এতদূর পাঠানোর ইচ্ছে তাঁর কোনকালেই ছিল না। কিন্তু সময় যত এগিয়েছে, প্রদীপ তার সাফল্যের ছাপ রেখেছে প্রতি পদক্ষেপে। চাকরিও পেয়েছিল ভাল সফটওয়্যার কোম্পানিতে। প্রদীপের বাবা ছিলেন দাপুটে সরকারী অফিসার। বাড়ি, গাড়ি কোন কিছুরই তাই অভাব নেই। আজ সকালে যখন প্রদীপের প্রোমোশনের চিঠিটা আসল যেখানে জানানো হয়েছে প্রদীপ কে কোম্পানির তরফে একটা অনেক বড় দায়িত্ব দিয়ে সুইডেন পাঠানো হচ্ছে বছর তিনেকের জন্য, অরিন্দমবাবু বা আভাদেবী কেউই খুব একটা অবাক হননি। শুধু মন থেকে সায় পাননি। আভাদেবী তো বলেই ফেলেছিলেন — ''না, না, ওই বিদেশ বিভূঁইয়ে একা একা যেতে হবে না। এখানে যেমন চাকরি করছো করো।'' অরিন্দমবাবু অবশ্য কিছু বলেননি। কারণ তিনি জানতেন ছেলের উচ্চাশার কথা। পরে স্ত্রী কে বলেছিলেন — ''নাগো, ওকে যেতে দাও। ছেলে বড় হয়েছে। আর কতদিন ওকে আঁচলচাপা দিয়ে রাখবে? আর দীপ তো সেই ছোটবেলা থেকে স্বপ্ন দেখেছে আকাশ ছোঁয়ার। আমি ই তো ওকে শিখিয়েছি ভালোর কোনও শেষ নেই। আজ যখন এতবড় একটা সুযোগ নিজে থেকে ওর সামনে এসেছে, ওকে আটকানোটা কি ঠিক হবে বল? আর তাছাড়া ফোন তো রইলো। আমরা বুড়োবুড়ি না হয় একটু কষ্ট করে ওই কি যেন বলে স্মার্টফোন না কি যে, ওটা একটু শিখে নেবো। আর আজকাল তো শুনি কিসব ভিডিও কল হয়েছে, ওতে তো ওকে দেখতেও পাব। গিন্নি তুমি আর অমত করোনা। তিনটে বছর দেখতে দেখতে কেটে যাবে।

স্ত্রীকে আশ্বস্ত করলেও নিজের মনের কাছে কিছুতেই সহজ হতে পারছিলেন না অরিন্দম বাবু। বারবারই তাঁর মনে হচ্ছিল ছেলের আজ যে এই আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্ন দেখা, তার বীজ তো তাঁরাই একসময় বপন করেছিলেন ছোট্ট প্রদীপের মনে, আজ তো সে ডানা মেলবেই। আর তো তাকে বন্দী করা সম্ভব নয় স্নেহের পিছুটানে।

সামনের মাসের ১৫ তারিখ তাদের ছেলেটা চলে যাবে দূর বিদেশে। আভাদেবী আর অরিন্দমবাবু রোজই টুকটাক করে জিনিষ কিনে গোছগাছ করছেন। নির্দিষ্ট দিনে এয়ারপোর্টে ছেলেকে বিদায় জানাতে এলেন দুজনেই। আভাদেবীর দু-চোখ মুছিয়ে প্রদীপ বললো, ''এত কেনো ভাবছো মা? পৃথিবীটা জানতো খুব ছোট্ট হয়ে গেছে এখন। আমি এপাড়ায় থাকবো, তোমরা ওপাড়ায়। ব্যাস এই তো, আর কিছু তো নয়। এত ইমোশনাল হয়ো না। পরে নিজেরই কষ্ট হবে। আর তাছাড়া ভিডিও কল তো রইলই।'' আভাদেবী নিরুত্তর দাঁড়িয়ে । তাঁর ছোট্ট দীপ যে কবে এত পরিণত হয়েছে এত উচ্চাকাঙ্খী হয়েছে, তিনি জানতেই পারেননি। নাকি, জানতে চাননি? ঠিক বুঝতে পারছিলেন না। অরিন্দমবাবু তাড়াতাড়ি বললেন, ''হ্যাঁরে জানিত। তুই ওসব নিয়ে একদম ভাবিস না। ওসব আমরা ঠিক সামলে নেবো। তুই সাবধানে যা। আর নিজের খেয়াল রাখবি।'' মাইকের আওয়াজে গমগম করে উঠলো গোটা লাউঞ্জ। এক বিমানকর্মী তিনটি ভাষায় চেকইন করার অনুরোধ জানাচ্ছেন। প্রদীপ বাবা মা কে প্রণাম করে এগিয়ে গেলো। ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন আভাদেবী আর অরিন্দম বাবু। আর যে ভিতরে যাওয়ার অনুমতি নেই। ওখান থেকেই ফিরতে হবে তাঁদের। ধীর পায়ে বিমানবন্দর থেকে বের হয়ে এলেন দুই বৃদ্ধ বৃদ্ধা। প্রদীপের বিমান তখন স্বপ্নডানায় ভর দিয়ে উড়াল দিয়েছে আকাশপথে।

(দুই)

''কী গো, কতদিন হয়ে গেলো, ছেলেটার কোনও খবর নেই! কি ব্যপার বলত? ''উদ্বিগ্ন স্বরে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন আভাদেবী। প্রায় বছরখানেক হতে চললো প্রদীপ গেছে বিদেশ। প্রথম প্রথম বেশ ঘন ঘন ফোন করত। খবর নিত। ভিডিও কলে দেখাতো কোয়ার্টারের ছবি। কোথাও ঘুরতে গেলে ছবি পাঠাতো। আভাদেবী আর অরিন্দম বাবুও বেশ আনন্দেই নিশ্চিন্তে ছিলেন। কিন্তু যতো সময় যেতে লাগলো, প্রদীপের যেনো ব্যস্ততা বেড়েই যেতে লাগলো। গেলো মাসের প্রথম দিকে সোমবার নাগাদ প্রদীপ ফোন করেছিল। কেমন যেনো কাঠ কাঠ কথাবার্তা। ওই নিয়মরক্ষার্থে যতোটুকু যা জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন পড়ে। কবে ফিরবে দেশে, জানতে চেয়েছিলেন আভাদেবী। এড়িয়ে গেছে ছেলে। অরিন্দমবাবুও যে আহত হননি, তা নয়, চেপে গেছেন। মুখে আশ্বস্ত করেছেন সহধর্মিণীকে ''আরে, তুমি এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? নিশ্চয়ই খুব কাজের চাপ আছে। তাই আর আগের মত আমাদের সময় দিতে পারছে না দীপ। এতে এত অস্থির হওয়ার কি আছে? ছেলে ছেলে বাতিকটা তোমার আর গেলো না। যখন সময় সুযোগ করতে পারবে, ঠিক আসবে। অতো ঘাবড়িয়ো না তো। ও আমাদের তেমন ছেলে নাকি যে বাইরের জল গায়ে পড়লে নিজের দেশ নিজের বাবা মা কে ভুলে যাবে? বড় বেশি ভাব তুমি''। ''না হলেই ভালো, তবু মা তো, বড্ড দেখতে ইচ্ছে করে ছেলেটাকে। ও তুমি বুঝবে না।'' বড়ো শান্ত গলায় উত্তর দেন আভাদেবী।

সেই সোমবারের পর থেকে আর কোনো ফোন নেই প্রদীপের। নেই কোনো বৈদ্যুতিন বার্তাও। স্মার্টফোন চালানো মোটামুটি শিখেই গেছেন দু'জনে। কিন্তু আজকাল আর ভালো লাগেনা। শীতের রাত যতো গভীর হয়, ততই যেন গাঢ় হয় তার অন্ধকার। সত্তরোর্ধ এই দুই বৃদ্ধ বৃদ্ধার জীবনেও যেনো এক নিশ্ছিদ্র অন্ধকার গ্রাস করেছে। দিনে দিনে কিসের শিকলে যেনো আটকা পড়ছেন তাঁরা। কিসের এই অন্ধকার? কিসের এই বন্দীত্ব? একাকীত্বের? নিঃসঙ্গতার? ঠিক জানেন না অরিন্দম বাবু।

(তিন)

ঠান্ডাটা আজ বেশ কম। রোদ্দুরটাও উঠেছে ঝলমলিয়ে। উৎসাহ পাওয়া যাচ্ছে বেশ সব কাজে। ঝটপট পটলপোস্ত আর আলুরদমটা নামিয়ে ফেললেন আভাদেবী। আজ তাঁর দীপ ফিরছে যে, কত্তোদিন পরে। ছেলের প্রিয় পদগুলো রান্না করতে হবে না! কত কাজ তাঁর। সত্তোরোর্ধ বৃদ্ধার বয়স যেনো এক ধাক্কায় নেমে এসেছে চল্লিশের কোঠায়। অরিন্দমবাবুকেও আজ বেশ তরতাজা লাগছে। মাঝখানে অ্যাজমার সমস্যাটা বেশ বাড়াবাড়ি হয়েছিল। দিন পনেরোর জন্য ভর্তি করতে হয়েছিল হাসপাতালে। সেবার প্রতিবেশীরা ছিল বলে রক্ষে। না হলে আভাদেবীর একার পক্ষে খুবই মুশকিল ছিল পরিস্থিতি সামাল দেওয়া। প্রদীপ নাকি অনেক চেষ্টা করেছিলো আসার কিন্তু শেষ মুহূর্তে বাবা সামলে উঠতে পেরেছেন জেনে আসার প্ল্যান বাতিল করে। যাই হোক, অরিন্দমবাবু সে ধাক্কা এখন অনেকটাই সামলে উঠেছেন। আসতে না পারলেও দীপ সে কটাদিন বেশ নিয়ম করেই ফোন করেছিলো। টাকাও পাঠিয়েছিল কিছু। তাও প্রায় কয়েকমাস হল। গেলো রবিবারেই দীপ খবর দিলো হোয়াটসাপ মারফত যে সে দেশে আসছে দিন কয়েকের জন্য। তারপর থেকেই আর দম ফেলার ফুরসত পাননি আভাদেবী। একমাত্র ছেলেকে দেখতে পাওয়ার অদম্য ইচ্ছেয় বয়স যেনো আর কোনও বাধাই নয়। কত পরিকল্পনা করে রেখেছেন। দীপকে আসলে বলবেন এবার পাকাপাকি ভাবে এদেশে থিতু হতে। তাঁদেরও বয়স হল। এভাবে একা একা জীবন আর ভালো লাগছেনা। এসব ভাবতে ভাবতেই একা একা হাতের কাজগুলো মিটিয়ে নিচ্ছিলেন আভাদেবী। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে হঠাৎ করেই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন তিনি। ''হ্যাঁগো, বেলা হয়ে গেলো এত, অথচ দীপের দেখা নেই, ওর কি কোনো কালেই আক্কেল হবেনাগো?'' অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে অরিন্দমবাবুকে প্রশ্নটা করতেই উত্তরটাও পেয়ে গেলেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। ''ফ্লাইট লেট আছে। অতো অস্থির হয়ো না।'' শান্ত স্বরে জবাব দিলেও তাঁর ভিতরেও যে চাপা অস্থিরতা কাজ করছে, তা বলাই বাহুল্য।

বেলা প্রায় চারটে। একটা দুধ সাদা গাড়ি এসে দাঁড়ালো বাড়ির দরজায়। ভিতর থেকে বের হয়ে আসলেন স্যুট টাই পরিহিত এক সাহেব আর স্কার্ট টপ পরিহিতা এক বিদেশিনী। বেল বাজতেই ছুটে বেরিয়ে এসে দরজা খুললেন আভাদেবী। নাহ্ বড্ড অচেনা যে, কিছুতেই চিনতে পারছেন না! কারা এরা? কোথায় তাঁদের দীপ? ভদ্রলোক সামান্য ঝুঁকে সম্ভাষন জানালেন পুরোদস্তুর বিদেশী কায়দায়। õùÊüò, "hello mom, hello dad! how are you?

ঘরের মধ্যে কালবৈশাখীর বাজ পড়লেও বোধকরি এতটা চমকাতো না কেউ। দীপ! তিনটে বছরে এত লম্বা একটা সময় যার মধ্যে তাঁর মা থেকে মম আর বাবা থেকে ড্যাড হয়ে গেছেন, জানতেই পারেননি! সাময়িক আঘাতটা সামলে উঠতেই প্রদীপ বললো, "meet Annie, she is my wife। আমরা বিয়ে করেছি। তোমাদের জানানো হয় নি।"

স্তম্ভিত হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন দুই বৃদ্ধ বৃদ্ধা। এই প্রদীপ তো তাদের আদরের খোকা নয়! একে তো তাঁরা চেনেনইনা। ছেলে তাঁদের এত বড় হয়ে গেছে যে হাত বাড়ালেও তাকে আজ আর ছোঁয়া যায় না। "তোরা কটাদিন এবাড়িতে থাকবি তো? হাত মুখ ধুয়ে আয়। খেতে দিচ্ছি।" বড় ক্লান্ত শোনালো আভাদেবীর গলাটা। "না, আমরা খেয়ে এসেছি। ওসব নিয়ে ব্যস্ত হয়ো না। আমরা চলে যাব। এয়ারপোর্ট এর কাছেই একটা হোটেল বুক করেছি। আসলে, Annie is not comfortable in such environment. তাই ওর কথা ভেবেই এই ডিসিশন। আর ও তোমাদের একবার দেখতে চেয়েছিলো বলেই ঘুরে গেলাম। আর হ্যাঁ, এই প্যাকেট টা রাখো। কিছু ডলার আছে। ভাঙিয়ে নিও। আবার কবে আসবো তো জানিনা। ওদের environment is too good. তাই ওখানে সেটল করছি। আর ফেরার কোনো ইচ্ছা নেই। তোমরাও তোমাদের মত করে এনজয় করো তোমাদের লাইফ। পরশুই আমরা চলে যাব। কষ্ট করে এয়ারপোর্ট অব্দি আসতে হবে না। চলি মম। ড্যাড আসছি।"

"হ্যাঁ, সেই ভালো। আমাদেরও মনে হয় তোমার আর এদেশে না ফেরাই উচিত। তোমার মত মানুষের প্রয়োজন এদেশে ফুরিয়েছে। তোমার পাকাপাকি ওদেশের বন্দোবস্ত করাই ভালো।" প্রদীপের এতগুলো কথা স্তব্ধ হয়ে শোনার পর এতক্ষণে জলদগম্ভীর স্বরে ছেলেকে বললেন Õ¸õ|ö÷õ±Å'' sorry dad, what are you saying? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না যে আমি কি এমন বললাম বা করলাম যে তোমাদের এভাবে রিঅ্যাক্ট করতে হবে। Annie was right. Indians are nothing but emotional fool. এই জন্যই দেশটার কিছু হল না।" "থাক, অনেক ভেবেছ তুমি দেশ নিয়ে আর আমাদের নিয়ে। নিয়ে যাও তোমার ডলার। আমরা তোমাকে ছেড়েই ভালো থাকবো এবার থেকে। কারণ তুমি আমাদের খোকা নও। আর তাই তোমার মুখ থেকে এই দেশের আর দেশের মানুষ জন সম্পর্কে একটাও কথা শুনতে চাইনা আমি। যে নিজের শিকড় ভুলে যায়, নিজের অস্তিত্ব কে বদলে ফেলতে পারে, মানুষ হিসেবে তার কোনো পরিচয় অন্তত আমার কাছে থাকে না।"

শীতের রাতগুলো বড় দীর্ঘ। চাপ চাপ অন্ধকার যেনো আচ্ছন্ন করে রাখে চারদিক। তখনও ভালো করে আলো ফোটেনি। ভোর হয় নি। সেই কালো অন্ধকারের বুক চিরে উড়ে গেল একটি বিমান। নিচে জানলার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে রইলো একজোড়া অশক্ত শরীর। ফেলে যাওয়া ধোঁয়ার কুণ্ডলীর দিকে তাকিয়ে আভাদেবীর মনে হল প্রযুক্তির জালে আজ বিশ্ব কি সত্যিই কাছে এসেছে? নাকি চলে যাচ্ছে আরো দূরে। সম্পর্কের শিকড় যাচ্ছে আলগা হয়ে। ফেলে যাচ্ছে শুধু নিঃসীম শূণ্যতা। একাকিত্বের বেড়াজালে জীবন হচ্ছে বন্দী। ঠিক ওই শীতের ভোরের বিবর্ণ ধোঁয়াশার মত! জানেন না আভাদেবী। একা তিনি। ভীষণ একা।

ইংরেজী ভাষার প্রখ্যাত লেখক স্যার অ্যান্থনী হোপ হকিন্স ১৮৯৪ সালে 'প্রিজনার অফ জেন্দা' উপন্যাসটি লেখেন। ১৯২২ সালে এই উপন্যাসকে অবলম্বন করে নির্বাক ছবি তৈরী হয়। ১৯৩৭ সালে ছবিটি পুনরায় তৈরী হয়। এবার হয় সবাক চিত্র। ১৯৫২, ১৯৭৯ এবং ১৯৮৪ সালেও ছবিটির নির্মান হয়েছে। এই কাহিনী অবলম্বনে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বিখ্যাত 'ঝিন্দের বন্দী' উপন্যাসটি লেখেন।

করোনা কাল

প্রদীপ ভট্টাচার্য

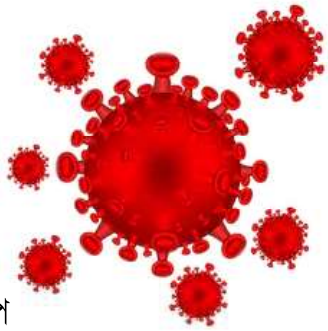

স্নান সেরে
কপালে টিপ
সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে
সে এসে দাঁড়ালো উঠোনে

এক উঠোন
দূর্গাপূজার রোদ

পাঁচিলের কোণে
তারি হাতে লাগানো
ফুলের গাছে
জেগেছে ফুলেদের ঘুম

দেখে তার খুশী
হওয়া উচিত
এটাই দস্তুর এরকমই হয়

কিন্তু
চোখে তার মেঘের ছটা
দীপ্তিহীন মুখ শুকনো ঠোঁটে
চেপে রাখা ব্যথা

এখন করোনা কাল
স্বামী তার ঘরে বসে
গত পাঁচ মাস

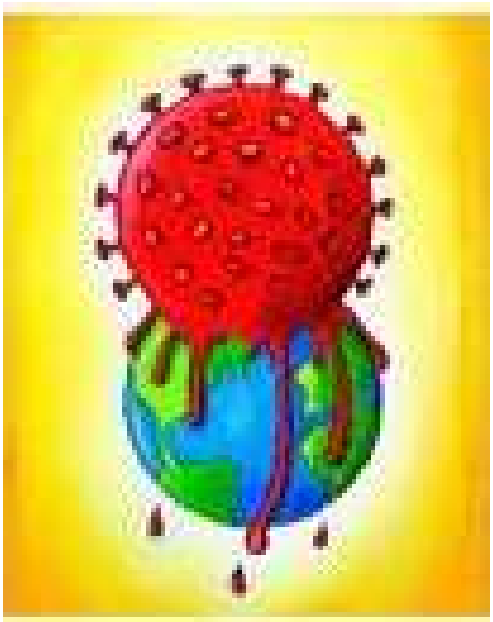

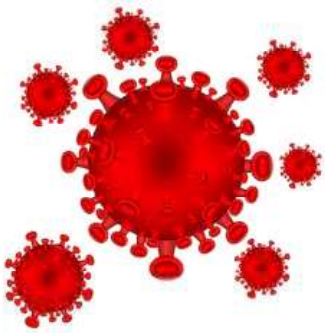

মেয়ের ইস্কুল নেই
জমানো টাকায়
দামী ফোন কিনে
ঘরে বসে ক্লাশ

কতদিন আর কতদিন
জানে না সে
এই ত্রস্ত বাস

শাশুড়ি শয্যাশায়ী
আতঙ্কে কাটে দিন
যদি বাড়াবাড়ি হয়
চিকিৎসা কোথায় পাবে
অনুভূতি চিনচিন

পাড়ার মোড়েতে বসে
স্যানিটাইজার মাস্ক
টেবিলে সাজিয়ে
ঘরের লোকটা ভাবে
আর কত বাড়বে যে ঋণ

কী হবে
আরও কিছুদিন পর
ভ্যাকসিন এসে যাবে
ভাইরাস চলে যাবে
শিউলি ঝরবে রাশিরাশি

দূর্গাপূজার রোদে
ফিরবে কি তার চোখে
ভুলে যাওয়া
সেই চেনা হাসি।

আরও দুয়েকটা দিন

সোমনাথ মুখোপাধ্যায়

হে মহানুভব,
আরও দুয়েকটা দিন
আমায় সময় দিন
এরপর তো সময়ের নিগুঢ় নিয়মে চলে যেতে হবে
চলে যেতে হয় বলে .....
ব্যাতিক্রমবিহীন অনিবার্য এই গতায়াত।
এসব কিন্তু সেই চলাচলের কথা নয়
এরই মধ্যে রয়ে গেছে
জীবনের ইতিকথা .....

এই যে এখন দিনান্তবেলায়
দাঁড়িয়ে আছি, কখনও জড়িয়ে আছি,
কখনও ছড়িয়ে আছি
মায়াপিপাসার ঘাটে নৌকা বেঁধেছি,
আমি সেইসব বৃত্তান্তের কথাই বলছি
কিন্তু বারেবারে বলতে চেয়েও দেখেছি
ফুটনোটে মৃত্যু ফুটে আছে।

কতকিছুই তো পরিত্যাজ্য ছিল
বিস্তর বিরোধাভাষ ছিল
সেসব বুঝেছি বহু পথঘুরে
আমার সঙ্গী তখন
বেনিয়মী জীবন যাপন

এই যে বেলা অবেলা কালবেলার কথামালায়
কল্পকথায় গল্পকথায়
জীবনকে উল্টোদিকে রেখে
মুখ দেখেছি একান্ত আয়নায়
হেঁটেছি অঘ্রাণের ধানকাঠা মাঠে
বিজন হেমন্তের হিম জ্যোৎস্নায়
কাটিয়েছি দিন আসলে
জীবনকে ভালবেসে

এই শেষ বিকেলের রঙেও
জীবনের কী অপূর্ব উল্লাস
হে মহানুভব, আরও কয়েকটা বিকেল
এখনো কী পাওয়া যেতে পারে
দেখে নিতে আদিগন্ত রক্তপলাশ?

মা

সোমনাথ মুখোপাধ্যায়

কতদিন হল তোমায় দেখিনি
আগে আসতে বলতে
পাশে বসতে বলতে
তারপর পাশে বসিয়ে বলতে
'অমানুষ', এরপর কান্নাজলে
ভাসতে, মা আমার মা .....

মা, তুমি কেমন আছ?
মা তুমি কোথায় আছো?
মা, আমি তোমার কাছে ফিরে যাব,
তোমার শরীরের অপার্থিব গন্ধ নেব
এবার আমার কথা রাখার
সময় হল .....

সে একটা সময় ছিল
পাঁচ ভাই আর প্রিয় দিদির
তেল-নুন-মরিচের মায়াবী
শারদ সংসার, মাথার ওপরে মা মহামায়া .....

এখন সে ভালোবাসার মন্ত্র
দিক হারিয়ে বেপথু বাতাসে
ভাসমান সময়ের নিয়মে
এই অসময়ে, মা তুমি কোথায়

জ্বর হলেই মাকে পাশে চাই
এখন সব কাজ ফেলে রেখে
মা, আমার কাছে এসে বোস
আমার মাথায় রাখ হাত
আমার সব অসুখ হবে নিরাময় .....

মা আমি অমানুষই রয়ে গেলাম
এবার দেখা হলে পালটে নেব
যাপনের মানে .....

মুক্তির অপেক্ষায়

প্রণবকুমার দাস

এ এক অস্থির সময় —
সকাল নেই, সন্ধ্যা নেই,
দুপুর নেই, রাত্রি নেই,
কেবল খাওয়া বা না-খাওয়া,
শোওয়া বা না-শোওয়া,
ঘুম বা না-ঘুম।

এ এক অশান্ত সময় —
কাজ নেই, উপায় নেই,
আড্ডা নেই, মস্করা নেই,
কেবল খরচ বা না-খরচ,
তথ্য বা না-তথ্য,
মৃত্যু বা না-মৃত্যু।

এ এক দুঃসহ সময় —
স্বপ্ন নেই, ছন্দ নেই,
সৃষ্টি নেই, লক্ষ্য নেই,
কেবল বন্দী বা না-বন্দী,
শঙ্কা বা না-শঙ্কা,
দ্বন্দ বা না-দ্বন্দ।

সত্যিই,
এ এক বড় দুঃসময় —
বন্ধ সবই বন্ধ
শরীর থেকে মগজ।

অপেক্ষা শুধুই অপেক্ষা
মুক্তির।

বন্দী যারা কষ্টে তারা

তাপস বাগ

বনের পাখি ধরে এনে
রাখছ কেন খাঁচায় ভরে,
ডানা মেলে উড়ে বেড়াক
আকাশটাকে আপন করে।

বাঁদর ছানা পোষ মানিয়ে
দেখাও কেন কঠিন খেলা,
বনের গাছে ডালে ডালে
থাকুক সুখে সারাবেলা।

ফুলের মতো অনেক শিশু
ফ্ল্যাট বাড়িতে বন্দী থাকে,
সবুজ মাঠে পায় না ওরা
মুক্তো খোলা আকাশটাকে।

হরেক দেশের কয়েদখানায়
বহু মানুষ বন্দী আছে,
পায় না দেখা আলোর সকাল
যেথায় খুশির ছন্দ নাচে।

লক-ডাউন

বিনয় সরকার

লক-ডাউন, লক-ডাউন, লক-ডাউন
একবার বিষয়টা ভালো করে বুঝুন।

লক-ডাউন মানে চা দোকানে
চা খাওয়া নয়,
পাড়ার মোড়ে জটলা কোরে
আড্ডা দেওয়া নয়।
লক-ডাউনে ঘরে থেকে
থাকুন সদা হাসি মুখে
সবার সাথে একসঙ্গে
ভালভাবে বাঁচুন না
একবার এর গুরুত্বটা
অনুধাবন করুন।

কারোর কাছে বিষয়টা যেন ছেলেখে
কিছুই না ভেবে তারা
করছে হেলাফেলা।

মহাবিপদ আসছে তেড়ে
প্রাণটা বুঝি নেবে কেড়ে,
এসব জেনেও দেখছি তাদের
ভীষণ অবহেলা।

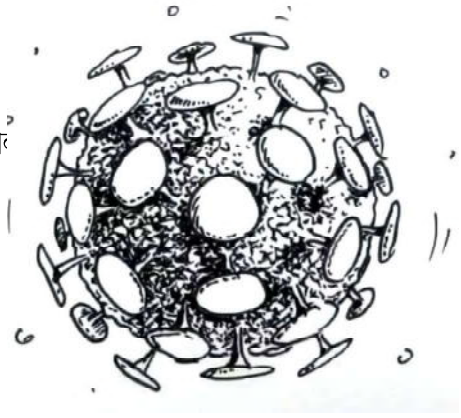

বিপদ আসলে রক্ষা নেই
মরে তে হবে সকলকেই
নিয়মগুলো এই সুবাদে
সকলেই তা মানুন।
ভয়াবহ এই মারণ রোগ,
থাক না এখন যোগাযোগ
আলিঙ্গন আর করমর্দনের
অনেক পাবেন সুযোগ।
সময়টা এখন ভালো নয়
কাটাতেই হবে দুঃসময়,
তাই তো বলি এই সময়টা
ঘরের মধ্যে বন্দী হয়েই থাকুন
মূর্খের দল বোঝেনা যারা
বুঝিয়ে তাদের বলুন।
বন্দীদশা বুঝবে ঠিকই
নতুন সকাল আসবে বৈকি
নতুন করে জাগবে সবাই
এই কথাটা মনে রাখুন।

বন্দী জীবন

প্রিয়া কুণ্ডু নন্দী

দীর্ঘ দিনের পর দিন
ছকে বাঁধা জীবন।
দরজা টেনেছে সভ্যতা,
নতুন সিরিজ বন্ধ —
পারস্পরিক আলোচনা
‘ লাইভ’ অনুষ্ঠান বন্ধ।
ভাইরাস ও লকডাউন
করেছে সর্বসান্ত।
পথিকের আশায় পথরাজ,
বন্ধ যানযন্ত্র।
অশুভ শক্তি বিনাশ
করব সবাই মিলে।

পশুপাখি বন্দী খাঁচায়
কয়েদিরা জেলে
ছোট্ট শিশু বন্দী থাকে
মায়ের আঁচল তলে।

একটু বড় হলেই শিশু
বন্দী লেখাপড়ায়
গান বাজনা আঁকা খেলায়
নানান কাজে জড়ায়।

যুবক-যুবতীরা বন্দী
যে যার নানা পেশায়
সেই সঙ্গে মন বিনিময়
বন্দী প্রেমের নেশায়।

তারপরেতে সংসারী হয়
দায়ভার সব কাঁধে
শেষ বয়সে হরে কৃষ্ণ
কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাধে।

অনেক বন্দী কষ্টের হয়
অনেক বন্দী সুখের
সুখ-দুঃখের মালা-জ্বালা
পাওনা শুধু বুকের।

ð Ä¿éÂß Â§õ î Â±

পুজোর দিনে, সাবধানে

জহর চট্টোপাধ্যায়

হঠাৎই ঘুম ভেঙে গেল মহালয়ার ভোরে
ধরমড়িয়ে উঠে শুনি রেডিও বাজছে জোরে।
বাইরে তখন অল্প আঁধার, ঘরের ভেতর আলো,
কানে এল চণ্ডীস্তোত্র, শুনতে বড়ো ভালো।
ছোট থেকেই শুনছি তবু নতুন লাগে আজও,
চেনা সে সুর বলছে যেন, পুজোর সাজে সাজো।
এবার কি আর পুজো হবে অন্য বারের মত,
ঘরে বাইরে দেখছি সবাই কষ্ট পাচ্ছে কত।
চাইছি সবাই আনন্দে থাক, পুজোর দিন চার,
সবার ওপর আশীষ ঝরুক 'আনন্দময়ী মা'র।
পুজোর দিনে সবাই মিলে রাস্তাঘাটে ঘুরলে,
বিপদ কিন্তু বাড়তে পারে রোগটা হঠাৎ ধরলে।
সাবধানতা নিতেই হবে অতিমারীর কালে,
রোগের ছোঁয়া লাগলে আছে ভোগান্তি কপালে।
পুজোর মজা এবারে তাই বাড়ির ভেতর হোক,
সে ই মানবে আমার কথা, সাবধানী যে লোক।

প্রতি বছর গাঁয়ের থেকে আসেন বাসু কাকা,
মহালয়ার সকালবেলা নিয়ম করে দেখা.
সঙ্গে থাকে বাবলু টুলি, কাঁসর হাতে বিশু,
প্রথম যখন দেখি তাদের আমি তখন শিশু,
দেখতে দেখতে বাড়ল বয়স গজালো গোঁফ দাড়ি
সারা বছর বাইরে থাকা পুজোর সময় বাড়ি।
এবার সবই উল্টো ধারা, বন্দী গৃহ কোণে,
কাজকর্ম ঘরে বসেই, কম্পিউটার আর ফোনে।
কষ্টে আছে বাড়ির সবাই, খবর দিল কাকা,
জোড়াতালির গেরস্থালি দুঃখ দিয়ে ঢাকা।
বাসু কাকা শয্যাশায়ী, চলতে লাগে লাঠি,
আক্ষেপ তার পারবে না আর দিতে ঢাকে কাঠি।
টাকা কিছু পাঠিয়েছিলাম, সামান্য তা খুবই,
কবে যে সব সচল হবে একলা বসে ভাবি।
জীবন যাপন থমকে গেলেও ঋতুর চাকা ঘুরছে,
রোদ ঝলমল নীলচে আকাশ, কালো মোঘে ঢাকছে।
শরৎ এল যেমন আসে, কিন্তু পুজো দূরে,
আগমনির সুর কেটে যায় পঞ্জিকারই ফেরে।
এবার প্রথম পেলাম না আর বাসু কাকার দেখা,
মহালয়ায় আলোর বেণু বাজল একা একা।